বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

মণি বাগচি

ভারতের বিজ্ঞানসাধক (৫)

বিজ্ঞানাচার্য

সত্যেন্দ্রনাথ

মণি বাগচি

দিবাকর সেন কর্তৃক পরিবর্ধিত

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শুধু একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ্ ও বিজ্ঞানী হিসেবেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বিজ্ঞানের আঙিনা পেরিয়ে সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এই বিজ্ঞানসাধকের আরো একটা বড়ো পরিচয় আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে তিনি দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগিয়ে তুলতে বিশেষ প্রয়াস পেয়েছিলেন। এদেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ তিনিই।

সকলের ওপর মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের যে পরিচয় তা তাঁর চরিত্রকে একটা বিশেষ মহিমায় মণ্ডিত করেছে। ঋষিকল্প এই বিজ্ঞান-সাধকের জীবন ও সাধনার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই বইতে দেওয়া হলো।

মণি বাগচি
৯০ বাগুইহাটি রোড কলকাতা-২৮

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

মূল গ্রন্থটির সঙ্গে সাজুয্য রেখে গ্রন্থটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করা হলো। আশা করি সংস্করণটি কিশোর সমাজে আদৃত হবে।

দিবাকর সেন
তত্ত্বাবধয়ক : জগদীশচন্দ্র বসু যন্ত্রাগার
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩৷১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড
কলকাতা-৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

নাস্তিবাদী নহ তুমি জানি—কিন্তু থাক আজ
আজ শুভ জন্মদিনে এ-বৃথা বিতর্কে কিবা কাজ ?
আজ শুধু চাই বন্ধু তোমার দানের অঙ্গীকারে
তোমাকে অভিনন্দিবে স্মৃতির মঞ্জুল উপচারে।
মনে পড়ে মৃদুভাষে স্নিগ্ধ হাসি ঝরায়ে তোমার
করেছ আমার তাপ উপশান্ত তুমি কতবার।
কতবার হৃদয়ের দুঃখব্যথা তোমারে জানায়ে
পেয়েছি নবীন আশা ভরসা তোমার স্নেহচ্ছায়ে।
কত না দ্বিধার সংশয়ের গ্রন্থি করেছ মোচন,
দিয়ে সান্ত্বনা তব দরদী প্রবোধে ক্ষণে ক্ষণ।
পথ আমাদের ভিন্ন, তবু লক্ষ্য একই অদ্বিতীয়
সত্যের সাধনা গণি উভয়েই চিরবরণীয়।

—দিলীপকুমার রায়

পরিণত বয়সে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

University of Delhi

निष्ठा धृतिः सत्यम्

This is to certify that the Degree of Doctor of Science in this University was conferred *Honoris Causa* on

Prof. Satyendra Nath Bose

at the Special Convocation held on the 2nd day of January, 1964.

Registrar
University of Delhi

Chancellor
University of Delhi

C. D. Deshmukh
Vice - Chancellor
University of Delhi

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক
ডি. এস. সি ডিগ্রীর প্রতিলিপি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পাঠগৃহ
22 ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা 6

The
Indian Statistical Institute

Statistics

Satyendra Nath Bose

Doctor of Science
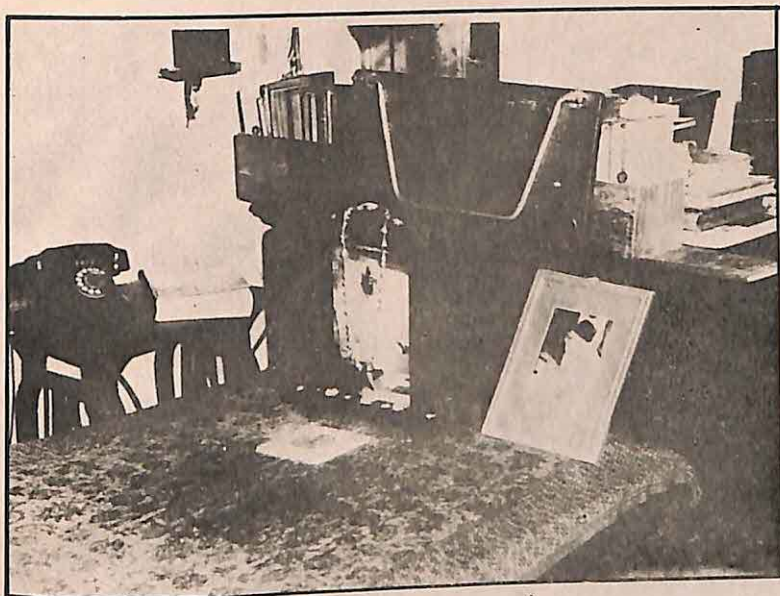
ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটের
পক্ষ থেকে আচার্য বসুকে অর্পিত মানপত্র
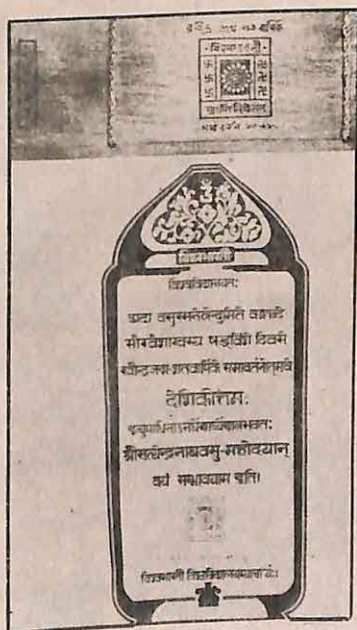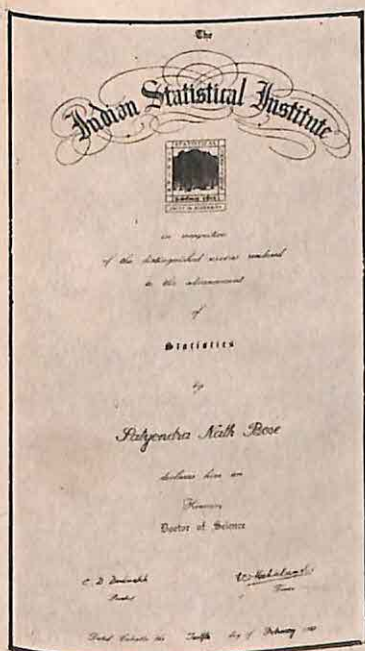
বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান
দেশিকোত্তম' উপাধির প্রতিলিপি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্রের
পাণ্ডুলিপির একটি পাতার প্রতিলিপি

ঘটনাটি খুবই চমকপ্রদ।

এটা ঘটেছিল বাহান্ন বছর আগে। ১৯২৪ সালে জুন মাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক তরুণ বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক জার্মানিতে মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনকে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিলেন। ছ'পৃষ্ঠার প্রবন্ধ—প্রবন্ধ ঠিক নয়, একটা সমীকরণ। এটি যখন আইনস্টাইনের হাতে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি সেটা এক নিঃশ্বাসে পাঠ করে রীতিমত চমকে উঠলেন। পত্র-প্রেরক কে তা তিনি চেনেন না, আর যেখান থেকে সেটি পাঠানো হয়েছে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও তিনি কখনও শোনেন নি। প্রবন্ধটির গুরুত্ব তিনি বুঝলেন—বুঝলেন এটি একটি মৌলিক গবেষণা।

আইনস্টাইন তখন কি করলেন জানো? সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটি জার্মান ভাষায় তর্জমা করলেন ও পরে সেটি জার্মানির এক বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সম্পর্কিত পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন আর পত্র-প্রেরককে একটি চিঠিতে জানালেন তাঁর অভিমত। যথাসময়ে প্রবন্ধটি সেই কাগজে ছাপা হলো আর সেই অখ্যাত ভারতীয় অধ্যাপকটি হয়ে উঠলেন জগদ্বিখ্যাত। এমন চমকপ্রদ ঘটনা আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে আর কখনো ঘটে নি।

এই তরুণ অধ্যাপকটির নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

কিন্তু তাঁর সার্বজনীন নাম 'সত্যেন বোস।'

আর বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে তিনি 'প্রোফেসর বোস'—এই নামে পরিচিত ছিলেন। পৃথিবীর তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের তালিকায় তাঁর নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়ে থাকে, আর আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে তাঁর নামটিও আজ উচ্চারিত হয়ে থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথের আদি বাড়ি ছিল কাঁচড়াপাড়ার কাছে বড় জাগুলিয়া গ্রামে। দু'পুরুষ আগে গোটা পরিবার বড় জাগুলিয়া থেকে কোলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন।

উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে বাইশ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনে লাল রঙের বাড়িটা আজো আছে। ১৮৯৪ সালের পয়লা জানুয়ারী এই বাড়িতে প্রথম চোখ মেলেছিলেন সত্যেন বোস। অবশ্য এই বাড়িটি ১৯০৯ সালের আগে দেখতে অন্য রকম ছিল। এ বাড়িতে তিনি জন্মালেও সে সময় পিতা সুরেন্দ্রনাথ জীবিকার প্রয়োজনে কলকাতার বাইরে থাকতেন। তিনি ছিলেন রেলের হিসাব রক্ষক। প্রায়ই তাঁকে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে রেললাইন পাতার কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। সেসময় এই বাড়ি ভাড়া দেওয়া হতো। আর পরিবারের সবাই অন্য কোন ছোট ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরবর্তী সময়ে আবার সত্যেন্দ্রনাথের গোটা পরিবার এই বাড়িতেই বাস করতে থাকেন। এই বাড়িতেই ১৯৭৪ সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে একতলার যেই ঘরটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি, সে ঘরটি হয়ে উঠেছিল এযুগের বিজ্ঞানতীর্থ। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নববর্ষের উপহার, যেমন, নিউটন ছিলেন ক্রীসমাসের উপহার। 'আমার জন্মের ঠিক পরের বছরটি অর্থাৎ ১৮৯৫ সালটি এদেশে বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছর মাস্টারমশায়[১] বেতার (wireless) আবিষ্কার করেন, আর স্যর পি. সি. রায়[২] আবিষ্কার করেন মারকিউরাস

১। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ২। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

নাইট্রাইট, রসায়নের একটা নতুন যৌগিক পদার্থ।'—এই কথা বলতেন সত্যেন বোস।

১৮৯৪, ১ জানুয়ারি যে নবজাতকটি জন্মগ্রহণ করেছিল গোয়াবাগানের বসু পরিবারে, সেদিন তাঁর পিতামাতা অথবা আত্মীয়স্বজন কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে এই ছেলেই উত্তরকালে পৃথিবীর বিজ্ঞানীসমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসবে ও সেই সঙ্গে তাঁর বংশ ও তাঁর জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করবে? সত্যেন্দ্রনাথের বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু এনট্রান্স অবধি পড়ে রেলের চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের এক বিখ্যাত উকিলের মেয়ে। পিতা সুরেন্দ্রনাথ খুব উদারচেতা ও মানবীয় গুণ-সম্পন্ন ছিলেন, মাতা আমোদিনী দেবীরও অনেক গুণ ছিল, বিশেষ করে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। সত্যেন্দ্রনাথ তার মাতা-পিতার প্রথম ও একমাত্র পুত্রসন্তান; ভাই বোন মিলে তাঁরা ছিলেন সাতজন। তিনি তাঁর মা ও বাবার চরিত্রের অনেক গুণ পেয়েছিলেন।

তাঁর বাবার কাছ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দুটো বিশেষ গুণ লাভ করেছিলেন, যেমন—উদারতা ও মানুষকে ভালোবাসা। আর তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন মনীষা। শোনা যায়, কেতাবী শিক্ষা খুব বেশি না থাকলেও আমোদিনী দেবী এক অসাধারণ স্বাভাবিক বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। স্বামীর অল্প আয়ের সংসার তিনি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন। এ ছাড়া মাতুল বংশেরও একটা ধারা—সংগীতপ্রিয়তা বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর মামার বাড়িতে খুব গান-বাজনার চর্চা ছিল; তাঁর এক মামাতো ভাই ছিলেন একজন নামকরা সেতারী।

তাঁর ছেলেবেলার কথা সত্যেন্দ্রনাথ এইভাবে বলতেন, 'আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি তখনকার কলকাতার চেহারা ছিল একেবারে আলাদা। আজকের মতো তখন রাস্তায় রাস্তায় বিজলী বাতির

বাহার ছিল না ; গ্যাসের আলো জ্বলত টিমটিম করে। পাকা ড্রেন তখনো দেখা দেয় নি। রাস্তার গায়ে গায়ে ছিল নর্দমা। ঘোড়ায় টানা ট্রাম মাত্র কয়েকটি প্রধান প্রধান রাস্তায় চলতো মন্থর গতিতে। এত লোকও তখন এই শহরে বাস করত না। চৌরঙ্গীপাড়াকে লোকে বলত সাহেব পাড়া—ঐ দিকটা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল দেখতাম। আমাদের ছেলেবেলায় দেখতাম অনেক সম্ভ্রান্ত বাড়ির বৌ-ঝিরা পালকী চড়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। আমার ঠাকুরমায়ের সঙ্গে আমিও একবার পালকী চড়ে বাগবাজারের ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলাম।'

সত্যেন্দ্রনাথের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁকে জোড়াবাগানের নর্মাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ছেলেবেলায় রবিঠাকুরও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তারপর সুরেন্দ্রনাথ যখন গোয়াবাগানে নিজস্ব বাড়িতে উঠে এলেন তখন বাড়ির কাছাকাছি নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে তিনি ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন। এখানে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ ভর্তি হন হিন্দু স্কুলে। এইটাই ছিল তখনকার দিনে শহরের সেরা স্কুল—হেয়ার স্কুলের সমান। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের সময়ে হিন্দু আর হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে খুব রেষারেষি চলতো। প্যারীচরণ সরকার যখন হেয়ারের হেড মাস্টার হয়ে এলেন তখন থেকেই এর নামডাক। সরকারী স্কুল, বড়লোকের ছেলেরাই এখানে পড়ত আর আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের জন্য ছিল হিন্দু স্কুল। রসময় মিত্র ছিলেন হেড মাস্টার আর অঙ্কের প্রধান শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্রলাল বক্‌সী। আমার স্কুল জীবনে চরিত্র গঠনের প্রাথমিক শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম নিউ ইণ্ডিয়ান ও হিন্দু স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে।'

১৯০৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথের এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হলো না। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার ঠিক দু'দিন আগে তাঁর হলো বসন্ত রোগ। সে-বছর শহরে এই রোগটা মহামারী

আকারে দেখা দিয়েছিল। পরীক্ষা দিতে পারলেন না। মনটা খুব খারাপ হলো। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য নিজেই বলেছেন—বাবারও মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। তিনি, ঠাকুর্দা হঠাৎ মারা যাওয়াতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন। তবু আমাকে আশ্বাস দিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'মন খারাপ করিসনে। এইতো সবে ছাত্রজীবনের শুরু ; একটা বছর নষ্ট হলে কিছু যায় আসে না।'

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর একমাত্র ছেলে, তাই তাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পিতা সুরেন্দ্রনাথ কোন ত্রুটিই করেন নি ; সব সময়ে তিনি তাঁর পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করতেন। বাবার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ পরের বছরে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন ও আরো একটা বছর হিন্দু স্কুলেই রয়ে গেলেন। কিন্তু সেই বছরটা তিনি শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। কলেজে গিয়ে তাঁকে অঙ্কের যে-সব বই পড়তে হবে সেগুলি তিনি বাড়িতে নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করতে লাগলেন। এছাড়া সংস্কৃতে মধ্য পরীক্ষা দেবার জন্য একজন পণ্ডিতের কাছে খুব যত্নের সঙ্গে কাব্যের পাঠ গ্রহণ করেন—পড়ে ফেললেন একে একে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কাব্য ও নাটকগুলি। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্নেহভাজন নীরেন্দ্রনাথ রায় এই ভাবে বলেছেন—সত্যেন্দ্রনাথের মন আগামী বৎসরের পরীক্ষার অপেক্ষায় কেবল পুরানো পড়ায় নিবদ্ধ থাকিতে চাহিল না। কলেজে গিয়া গণিতের যে সব বিষয় পরে পড়িতে হইবে তাহা তিনি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন নিজের চেষ্টায়। সংস্কৃত কাব্যপাঠের মধ্য-পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী প্রভৃতির কাব্যাবলী পড়িয়া ফেলিলেন। আর পড়িলেন ঐতিহাসিক গ্রীন-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ—"এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দি ইংলিশ পীপল।"

১৯০৯ সাল।

হিন্দু স্কুল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করলেন। বাবা খুশি হলেন, কিন্তু

ছেলে খুশি হতে পারলেন না, উত্তীর্ণদের তালিকায় তাঁর নামটি প্রথমে থাকবে, এই রকম আশাই মনে মনে পোষণ করতেন সত্যেন্দ্রনাথ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেই বছরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেঘনাদ নামে একটি ছাত্র পাশ করেন এবং তিনি পূর্ববঙ্গের সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন ও ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পান। সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ দু'জনে কলেজে মিলিত হন ও একে অন্যের বন্ধু হন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ, নিলেন 'বি' কোর্স। তাঁর অনুরাগ ছিল বিজ্ঞানের প্রতি। স্কুলে অঙ্কে তাঁর আশ্চর্য মেধা আর স্মরণশক্তি দেখে তাঁর সকল শিক্ষকই বলতেন, সত্যেন সায়ান্সেই নাম করবে। তাঁর শিক্ষকদের এই আশা তিনি সফল করেছিলেন। হিন্দু স্কুলে টেস্ট পরীক্ষায় তিনি একশোর মধ্যে একশো দশ পেয়েছিলেন। পরীক্ষক ছিলেন অঙ্কের হেডটীচার উপেন বকসী। দ্বিতীয় শ্রেণীর কৌতূহলী ছাত্ররা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, স্যর এটা কি করে সম্ভব হলো? তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন, প্রশ্নপত্রটি একবার ছাখো। প্রশ্ন আছে মোট এগারোটা, বলা আছে উত্তর দিতে হবে দশটির। সত্যেন এগারোটা প্রশ্নের উত্তর করেছে নিভু‍ঁলভাবে। তাই আমি তাকে ফুল মার্কস-এর ওপর দশ নম্বর বেশি দিয়েছি।

তাঁর এই শিক্ষকই বলতেন, মাস্টারী করছি অনেক বছর, কিন্তু সত্যেনের মতো এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র কখনো দেখি নি। আমার ধারণা সত্যেন ভবিষ্যতে পিথাগোরাস বা লা-প্লাসের মতো প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ হবে। পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে সত্যেন্দ্রনাথের বিস্ময়কর অবদান তাঁর এই শিক্ষকের ধারণাকে কিভাবে সত্যে পরিণত করেছিল, সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব। ১৯০৯ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ এনট্রান্স পরীক্ষা হয়; ১৯১০ সাল থেকে শুরু হয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। 'আমরা ছিলাম এনট্রান্সের লাস্ট ব্যাচ্'—বলতেন সত্যেন্দ্রনাথ।
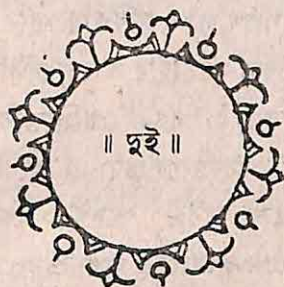
প্রেসিডেন্সি কলেজে শুরু হলো সত্যেন্দ্রনাথের গৌরবময় ছাত্র-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। এখানে বড়লোকের ছেলেরাই পড়তো। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের এখানে প্রবেশ খুব সহজ ছিল না। একমাত্র ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য সুরেন্দ্রনাথ অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি এবং এই দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করতেন। ছাত্রজীবনের গোড়া থেকেই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞান আহরণের চেষ্টা ও ইচ্ছা এবং গণিতে অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। আই. এস-সির ছাত্র হিসাবে তিনি ভর্তি হলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠী হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ যাঁদেরকে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিন বিহারী সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দ।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন পার্সিভাল, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ইংরাজি); বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিস, ডি. এন. মল্লিক (গণিত); জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (পদার্থ বিজ্ঞান) আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (রসায়ন)।

চাঁদের হাট বললেই হয়! তবে ছাত্রমহলে সবচেয়ে বেশি নাম ছিল ছু'জনের—জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের। এঁদের কাছে পাঠ গ্রহণ করা ছাত্রদের কাছে সৌভাগ্যের বিষয় বলে গণ্য হতো।

এনট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করার জন্য কলেজে সত্যেন বোসের নামটা তাঁর সকল সহপাঠীর কাছে সুবিদিত ছিল। তাঁর এক সহপাঠী লিখেছেন—'আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই তখন পরস্পরের মধ্যে কোন আলোচনা না করেই সকলে বিজ্ঞানের সেবা করব—এই প্রতিজ্ঞা করি। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে আমরা মানুষ হই। স্বদেশপ্রেম আমাদের মধ্যে প্রবলভাবেই ছিল। আমরা বিজ্ঞান অধ্যাপনা ও গবেষণা করব স্থির করেছিলাম ও কাজেও তা করেছি। আমাদের মধ্যে পাঁচজন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হয়েছি।' সবাই জানে সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন কিভাবে বিজ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অন্যদিকে তাঁর কিশোরসুলভ ছুষ্টুমিও ছিল অনেক। মাঝে মাঝে কুটিল প্রশ্ন করে অধ্যাপকদের বেশ বিব্রত করতেন। এরই ছু'একটা গল্প এখানে বলছি।

একবার আই. এস-সি ক্লাসে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বলবিদ্যার (Mechanics) সংজ্ঞাটি ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করছিলেন—

Force × Distance = Work.

মাস্টার মশাইয়ের এই ব্যাখ্যা বুঝতে না পারার ভান করে সত্যেন্দ্রনাথ একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, স্যর, একটা ভারী পাথর ঠেলে ঠেলে আগাগোড়া ঘেমে গিয়েও যদি আমি সেটাকে এক চুলও নড়াতে না পারি তা'হলে কি Work হলো না?

মাস্টারমশাই কিন্তু এই প্রশ্নটির মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি দেখতে পেয়েছিলেন এবং এতটুকু অসন্তুষ্ট হন নি।

ক্লাসে তিনি একেবারে পেছনের দিকেই বসতেন ও সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করতেন। একদিন অঙ্কের ক্লাসে পেছনের বেঞ্চিতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছেন! এমন সময় গণিতের অধ্যাপকের দৃষ্টি পড়লো লাস্ট বেঞ্চিতে। —সত্যেন, বোর্ডের কাছে এসো তো।

সত্যেন এলেন। ক্লাসের সবাই ভাবছে আজ তার কপালে নিশ্চয়ই লাঞ্ছনা আছে। সকলের দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয় বোর্ডের সামনে দণ্ডায়মান সত্যেনের ওপর। মাস্টার মশাই তখন গম্ভীরভাবে বললেন, যে অঙ্কটা বোর্ডে কষাচ্ছিলাম সেটা করো তো।

মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে খড়ি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কটা কষে দিলেন। আসল কথা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করলেও তাঁর চোখ ছিল বোর্ডের অঙ্কের দিকে। তাই অঙ্কটা করতে তাঁর ভুল হলো না এতটুকু।

সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কি রকম গভীর ছিল তাঁর একটা ঘটনা বলি। তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন জানা গেল পার্সিভাল সাহেব কয়েকদিন পরেই অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডে চলে যাবেন। একথা শুনে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কাছে আর্জি পেশ করলেন, অন্তত কিছুদিনের জন্যেও তাঁরা পার্সিভালের কাছে পড়তে চান। পার্সিভাল বি. এ. ক্লাসের নীচে পড়াতেন না। কিন্তু ছাত্রদের এই আবেদনের কথা জেনে ক্লাস নিতে রাজী হলেন ও মিলটন পড়ালেন।

সে বছর আই. এস-সি'র টেস্ট পরীক্ষায় পার্সিভাল সাহেব নিজে থেকেই ইংরেজী রচনার অংশ পরীক্ষা করলেন। দুটি ছাত্রকে একশোর মধ্যে ষাট দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন কলা বিভাগের। অন্যজন বিজ্ঞান বিভাগের সত্যেন বোস। শুধু তাই নয়; সত্যেন্দ্রনাথের খাতার ওপর তিনি লিখে দিয়েছিলেন—এই ছাত্রটি অসাধারণ। একে আমি আরো দশ নম্বর বেশি দিলাম।

কারণ এর নিজস্ব বলবার ক্ষমতা আছে। পার্সিভালের মতো অধ্যাপকের কাছ থেকে এই রকম নম্বর পাওয়া বড়ো সোজা কথা ছিল না।

আই. এস-সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তাঁর ছাত্রজীবনে প্রথম স্থান অধিকারের এই গৌরব পরবর্তী ছুটি পরীক্ষা পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠলেন তখন ঢাকা কলেজ থেকে তাঁর সহপাঠী হয়ে এলেন মেঘনাদ সাহা। ছু'জনেই গণিতে অনার্স নিলেন। যাকে বলে দেদীপ্যমান ছাত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ ছু'জনে ছিলেন ঠিক তাই। প্রতিভা আর এক প্রতিভা আকর্ষণ করলো—ছু'জনের মধ্যে স্থাপিত হয় বন্ধুত্বের প্রগাঢ় বন্ধন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা মধুর ও উদার ভাব ছিল যে জন্যে যে-কেউ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতো, স্বল্প দিনের মধ্যেই সে তাঁর বন্ধু হয়ে উঠতো। বন্ধু হলেও ক্লাসে এবং পরীক্ষায় তাঁরা ছু'জনে ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বি. এস-সি ক্লাসেই এই ছুই বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন।

ছাত্রজীবনে সমাজসেবার কাজ তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। যে বছর তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দেন সেই বছরে তিনি উদ্যোগী হয়ে পাড়ার কয়েকজনের সহায়তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এটি আজ 'বয়েজ ওন লাইব্রেরি' নামে বিখ্যাত। তিনি আজীবন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন কলকাতায় 'ওয়ার্কিং মেনস্ ইনস্টিটিউট' নামে দিনমজুরদের জন্য একটা নৈশ বিদ্যালয় ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। তাঁরই অনুরোধে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছুই বন্ধু এখানে অনেকদিন শিক্ষকতা করেছেন। খেলাধূলোতেও তাঁর আকর্ষণ বড়ো কম ছিল না। কলেজে পড়বার সময় তিনি ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ও টেনিস

খেলায় উৎসাহের সঙ্গেই যোগদান করতেন। তাস ও দাবা খেলাতেও তাঁর অনুরাগ ছিল। দেশের কাজেও তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে গঙ্গার ধারে যেতাম; রাখীবন্ধন উৎসবেও যোগ দিয়েছিলাম।'

সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের কথা নীরেন্দ্রনাথ রায় এইভাবে বলেছেন—আমি যখন স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, সত্যেন্দ্রনাথের তখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। কিন্তু তখনই তিনি আমায় দিলেন তাঁর পড়িবার ঘরের অবাধ স্বাধীনতা।...স্কুলের পড়ার যখন যতটুকু দরকার তাতে আর কতটুকু সময় লাগিত। বাকী সময়ে কাজ ছিল দাদার সঙ্গে গল্প করা, তাঁর অবসর মতো। এই গল্প-আলোচনার ভিতর দিয়াই হইত আমার প্রকৃত শিক্ষা। আমার ধারণায়, দাদা সেই-প্রকৃতির লোক যাকে বলা যায় "জাত-মাস্টার"। কোন কিছু পড়িয়া ভালো লাগিলে তা তখনই আমায় বোঝাইতেন। যে কোন বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর অনন্যসাধারণ। কেবল আমি নই, সেই সময়ে কত যে ছাত্র তাঁর কাছে আসিত পড়া বুঝিয়া নিতে তা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁর নিজের পড়া যে কখন করিতেন, বোঝাই যাইত না। আসল কথা, তাঁর নিজের পড়া তিনি অনেক আগেই শেষ করিয়া রাখিতেন। কলেজের ক্লাসগুলিতে হইত তাঁর রিভিসন্-এর কাজ।...তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের 'মেঘদূত' হইতে আবৃত্তি আমি অনেকবার শুনিয়াছি। আর দেখিয়াছি, হিস্টোরিয়ান্স হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড সিরিজের ফরাসী দেশের ইতিহাসের বিপুল গ্রন্থ এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতেন। জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টায় তিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও মানবিক শাস্ত্র, ইহার কোন বিভাগকেই তিনি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। শারীরিক কুশলতায়ও তিনি সব্যসাচী, কেননা, লেখার ও খাওয়ার ব্যাপারে তিনি দক্ষিণ হস্তের ব্যবহারে সুদক্ষ হইলেও একটা পেনসিল

কাটিতে গেলে তাঁর বাম হস্ত আগাইয়া আসে। ক্যারম, ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস খেলাতেও তিনি বামপন্থী। ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এস-সিতে দাদাই প্রথম হইলেন। কিন্তু তাঁর বি. এস-সি পরীক্ষার একটি দিনের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এই সময়ে হেদুয়া পুকুরের একটি কোণে, এখন যেখানে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের প্যাভিলিয়ন, শীতের শেষে ও পরীক্ষা পর্বের অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন কলেজের কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছাত্রদের একটা মণ্ডলী জমায়েত হইত প্রতি সন্ধ্যায়। এই মণ্ডলীর কেন্দ্রে ছিলেন সত্যেন বোস। ম্যাট্রিক দেবার পর আমিও তাতে যোগ দিতাম। তার আগে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমাকে বিকালের খেলাধূলার পর বাড়ীতে ফিরিতে হইত। গ্যাসের বাতি জ্বালার আগে, মায়ের কড়া হুকুমে। ম্যাট্রিক দিবার পর হেদুয়ার আড্ডা হইতে সন্ধ্যা হইতেই উঠিয়া পড়িতেছি দেখিয়া দাদার প্রশ্ন—কোথায় যাচ্ছিস ? উত্তর দিলাম—বাড়ী। দাদার নির্দেশ আসিল—"বোস। দেরী হলে একদিন বকুনি খাবি, দ্বিতীয় দিনও খাবি তারপর থেকে আর কেউ বকবে না।" জীবনে এই আমার প্রথম মুক্তির আস্বাদ বাড়ীর শাসন হইতে। কিন্তু দাদার মুক্তির আদেশে শাসনের বাঁধনও কম ছিল না। সপ্তাহে তিন দিন শ্রমজীবীদের নাইট স্কুলে পড়াইতে যাইতে হইত, সন্ধ্যার আড্ডার মোহে আটক থাকিবার জো ছিল না। বি. এস-সি পরীক্ষার গণিতে অনার্সের পালা চলিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থী। সে তখন প্রায়ই খালি গায়ে একটা চাদর চড়াইয়া আসিত। প্রথম দিনের পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ? সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, চারিদিকে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের দেখা নাই। আমি ভাবিতেছি, একবার তার বাড়িতে গিয়া দেখিয়া আসিব কি না। এমন সময় দেখা গেল দাদাকে। তার এমন বিশীর্ণ বিষণ্ণ চেহারা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমরা নির্বাক

হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে-ই বলিল—"আমি সব কটা অঙ্ক কষতে পারি নি। এই প্রথম পরীক্ষার হল থেকে অঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। কী শুষ্ক, করুণ শোনালো তার কণ্ঠস্বর। পরে জানা গেল, কেম্ব্রিজের সিনিয়র বাংলার পরাঞ্জপে সাহেব এমন কঠিন ও দীর্ঘ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও তিন ঘণ্টার মধ্যে ৭৮ নম্বরের বেশী উত্তর করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইহার বৈপরীত্যে একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের এম. এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কমন রুমে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি দাদা সেখানে।···জানতে পারা গেল সে আসিয়াছে ইউনিভার্সিটি অফিসে মার্কশীট নিতে। খুলিয়া পড়িয়া দেখি—অবাক কাণ্ড! আটটি পেপারের ছুটিতে ফুল মার্কস্, আর দু একটিতে ৯৬-এর কাছাকাছি, সবচেয়ে নীচু নম্বর হচ্ছে ৮৮।

১৯১৩।

অঙ্কে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সে বছর প্রশ্নপত্র খুবই কঠিন হয়েছিল। তৃতীয় পত্রের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর না লিখেই চলে আসেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক সহপাঠীকে বলেছেন—'পরীক্ষা ভালো হয় নি। জীবনে এই প্রথম কয়েকটা অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে এলাম।' তবু ঐ তৃতীয় পত্রে তিনি একশোর মধ্যে আটাত্তর পেয়েছিলেন। পরীক্ষায় প্রথম হলেন তিনি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন মেঘনাদ। এঁরা দুজনেই মিশ্র গণিত নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এস-সি পড়েন। এই সময়ে তাঁর বিয়ে হয়।

১৯১৫। এম. এস-সি. পরীক্ষা দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় প্রতিযোগিতা হয় সে বছর। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুলো। দেশসুদ্ধ লোক জানল সত্যেন্দ্রনাথ বোস প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। দ্বিতীয় হয়েছেন মেঘনাদ সাহা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাতেই সমানভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ।
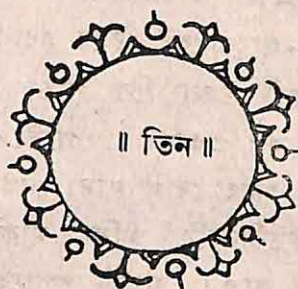
—এখন কি করবে ?

—প্রোফেসরি করব। কয়েকটা কলেজে দরখাস্ত করেছি।

—পাশ করার পর পাঁচ-ছ'মাস্ তো কেটে গেল তোমার। তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, তবু তোমাকে এখনো বসে থাকতে হচ্ছে।

—আপনি কি করতে বলেন, বাবা ?

—রেলওয়ে সার্ভিসের জন্য চেষ্টা করতে পারো। আমার জানা-শোনা দু-একজন সাহেবকে এ বিষয়ে ধরতে পারি।

—না বাবা। রেলের চাকরি করব না।

একদিন সকালে গোয়াবাগানে তাঁদের বাড়িতে পিতাপুত্রে এই রকম কথাবার্তা হচ্ছিল। তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলেই আশা করেছিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ এম. এস-সিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, তাঁকে নিশ্চয়ই কোন ভাল কলেজ অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লুফে নেবে। কিন্তু ভাবতে বিস্ময় লাগে। এই কৃতী যুবকের সামনে সেদিন তাঁর যোগ্য পথ খোলা ছিল না। কয়েক মাস কেটে গেল। এমন সময় তাঁর এক বন্ধু একদিন একটা প্রাইভেট টিউশনির খবর দিলেন। আসাম গৌরীপুরের জমিদার-

পুত্রকে পড়াতে হবে। সপ্তাহে তিন দিন, মাইনে মাসে দু'শো টাকা, আই. এস-সি ক্লাসের ছাত্র। তিনি রাজী হলেন। এই সময়কার কথা সত্যেন্দ্রনাথ এইভাবে বলেছেন—

'পাশ করার পর প্রথম একটা বছর আমি টিউশানি করে কাটিয়েছি। এই সময়ে বাইরের দু'একটা কলেজে ও অন্যান্য সরকারী অফিসে চেষ্টাও করেছিলাম। যাকে পড়াতাম সে এখন সিনেমা জগতের দিক্‌পাল কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। পাটনা কলেজে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। উইলসন সাহেব তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। স্যার যদুনাথ সরকার তখন সেখানে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে আমার চাকরি হলো না; তাঁরা জানালেন, তাঁদের দরকার একজন সেকেণ্ড ক্লাস এম. এস-সি। তখন ভাবলাম, বোধ হয় ফার্স্ট ক্লাস না পেয়ে সেকেণ্ড ক্লাস পেলেই বুঝি ভালো ছিল। আর একবার বাবার এক বন্ধুর কথা মতো আলিপুরে হাওয়া অফিসে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। জবাব এলো—বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম একজন কৃতী ছাত্রের উপযুক্ত কোন চাকরি এখানে খালি নেই। প্রার্থী অন্য কোথাও দরখাস্ত করলে ভালো হবে।'

দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে গেল।

ঠিক এমনি সময় একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা চিঠি তিনি পেলেন। তাতে অবিলম্বে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ ছিল। স্যার আশুতোষ তখন উপাচার্য। সত্যেন্দ্রনাথ দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে।

—তুমি সত্যেন বোস? মিশ্র গণিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সায়ান্স কলেজে তোমাকে লেকচারার নিযুক্ত করব ঠিক করেছি, রাজী আছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু তার আগে একটা বছর তোমাকে তৈরি হতে হবে।

হাতে যেন স্বর্গ পেলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ১৯১৭ সালে ইউনিভার্সিটি সায়ান্স কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হলেন। পড়াতে হলো পদার্থ বিদ্যা ও মিশ্রগণিত। চার বছর এখানে ছিলেন। একা নন; তাঁরা তিন বন্ধু—তিনি, মেঘনাদ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—একসঙ্গে সায়ান্স কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। শুরু হল তাঁর কর্মজীবন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯১৪ সালে আশুতোষ যখন বিজ্ঞান কলেজের শিলান্যাস করেন তখন বিজ্ঞান জগতে এসে গিয়েছে নব্য পদার্থ বিজ্ঞান আর আধুনিক গণিত। তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যাতে এই দুইটি বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় সেজন্য ১৯১৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তিনজনে মিলে আশুতোষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। আশুতোষ এই তরুণদের কথা মন দিয়ে শুনলেন। প্রস্তাবটা ভালো, কিন্তু কাজটা যে কতখানি কঠিন তাও তিনি অনুমান করলেন। উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়? তখন তিনি এই তিনজনকে এক বছরের জন্য বৃত্তির (stipend) ব্যবস্থা করে দিলেন।

—তোমরা আগে তৈরি হয়ে নাও। আমি নিশ্চয়ই পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে মিক্সড ম্যাথমেটিকস আর নিউ ফিজিক্স-এর পঠন-পাঠন চালু করব।

এই কথা তিনিই বলেছিলেন যিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতা-পুরুষ। ১৯১৭ সাল থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তিনজন নবীন অধ্যাপককে ভরসা করেই আশুতোষ এই অসাধ্যসাধন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—তিনজন এক সঙ্গেই বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন এখানে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ও দেবেন্দ্রনাথ

বসু। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয় ও পরে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালক। প্রফুল্লচন্দ্র সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে আশুতোষের অনুরোধে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেছিলেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে ১৯১৭ সালটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। আশুতোষের চেষ্টায় ও দু'জন স্বনামধন্য বাঙালী সন্তানের বদান্যতায় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তেমনি এই বছরে স্থাপিত হয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর— বসু-বিজ্ঞান মন্দির (Bose Institute)। সেই থেকেই ভারতে বিজ্ঞান অনুশীলনের পথ অনেকখানি সুগম হয়। এই মহানগরীর একই সড়কের ওপর এই দুটি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে এই দুই বরেণ্য বাঙালী সন্তানের মহিমা ঘোষণা করছে।

নবীন প্রাণের সতেজ উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে দুই বন্ধু— সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ—বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হলেন। উচ্চতর পদার্থ বিদ্যার পঠন-পাঠন ও গবেষণায় তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ গ্যাসীয় অবস্থা সম্বন্ধে একটা মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হলো বিলাতের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন-এ। এই প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ যে সূত্র প্রমাণ করেন সেটি 'সাহা-বোস' সমীকরণ নামে সুপরিচিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বিজ্ঞান জগতে তুমুল আলোড়ন নিয়ে এসেছে আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity)। সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ দুই বন্ধু মিলে এই আপেক্ষিক তত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ মূল জার্মান থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৯২০ সালে এই প্রবন্ধগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এটাই ছিল সেদিন আইন-

স্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ। বইটি এদেশের বিজ্ঞানীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯২১।

সত্যেন বোসের শিক্ষক জীবনে একটা স্মরণীয় বছর।

এ বছর তিনি ও তাঁর বন্ধু মেঘনাদ সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার (Reader) হিসাবে যোগদান করেন। এটি তখন সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ করে গঠিত হয়েছিল এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, এর তহবিলে টাকাও অঢেল। আর ঠিক সেই সময়ে দারুণ টাকার অভাব দেখা দিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে। অধ্যাপকদের অনেক মাসের মাইনে বাকী। অনেক অধ্যাপক এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন যেন ভাঙন শুরু হয়েছিল।

এখানে তখন রীডারের পদ ছিল না। ছিল শুধু লেকচারার ও প্রফেসর এ দুটি পদ। ঢাকায় রীডারের পদের জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে দরখাস্ত করতে হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমন্ত্রণ এসেছিল। তিনি ঢাকায় যাচ্ছেন শুনে স্যার আশুতোষ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, কেন যাবে? মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখানেই থাকো।

—আমি যাবো বলে কথা দিয়েছি।

—তবে যাও।

সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে এখানকার পদার্থবিদ্যার বিভাগটি বেশ ভালো করে গড়ে তুললেন। ১৯২৩-২৪ সালে অধ্যাপনার অবসরে গবেষণায় মন দিয়েছিলেন ও তাঁর একটি গবেষণা প্রবন্ধ ইংলণ্ডের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেটি ছাপাতে অযথা দেরী করতে থাকেন। তখন তিনি ঐ প্রবন্ধের একটা অনুলিপি পাঠিয়ে দেন

আইনস্টাইনের কাছে ও তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। এর ফল কি হয়েছিল তা তোমরা বইয়ের গোড়াতেই পড়েছ। আইনস্টাইন একটি চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর অভিমত জানালেন।

আইনস্টাইনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই চিঠি পেয়ে তাঁর খুব সুবিধা হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তিনি সেই চিঠি দেখালেন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সত্যেন্দ্রনাথ যখন এখানে রীডার নিযুক্ত হন তখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজের খরচে তাঁকে য়ুরোপে পাঠাবেন গবেষণাব জন্য। চিঠিখানাতে তাঁর বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা আরো সুনিশ্চিত হলো। আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী যাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন তাঁকে আর অবহেলা করা গেল না। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন তাঁকে বিদেশে পাঠালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামই বৃদ্ধি পাবে। তখন তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের য়ুরোপ যাওয়ার টাকা মঞ্জুর করে দিলেন। এটা দু'বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

আলবার্ট আইনস্টাইনকে (১৮৭৯-১৯৫৫) সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু বলে স্বীকার করতেন। বলতেন, 'আমি তাঁর একলব্য-শিষ্য।' আজীবন তিনি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম যে চিঠিখানি তিনি তাঁর গুরুকে পাঠিয়েছিলেন—সেই চিঠিখানাই গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পরিচয়ের সেতু বেঁধে দিয়েছিল সেদিন। সেই পরিচয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আইনস্টাইন তখন বার্লিনের একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞান-সাধক সত্যেন বোসের বিজ্ঞান-সাধনার পটভূমিকায় যিনি অনেকখানি স্থান জুড়ে আছেন সেই মহাবিজ্ঞানীর জীবনকথা এখানে সংক্ষেপে বলছি।

আইনস্টাইন সেই মুষ্টিমেয় মানুষদের মধ্যে একজন যাঁদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী পথে অনেক দূর অনেক শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত। যুগান্তকারী আপেক্ষিক তত্ত্বটি

তিনি যখন আবিষ্কার করেন তখন আইনস্টাইনের বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বছর। এই শতাব্দীর সূচনাকালে বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন যখন তাঁর নবীন প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন তখন থেকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে চিরদিনের মতো মুছে গেল নিউটনের জগৎ আর সেইখানে দেখা দিল এক নতুন পৃথিবী—আইনস্টাইনের পৃথিবী।

সেইদিন থেকে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক চিন্তার একটা যুগ শেষ হয়ে শুরু হলো আর একটা নতুন যুগের—একটা অচিন্ত্যনীয় নতুন যুগের। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা উপলব্ধি করা কঠিন—অনুসরণ করা তো দূরের কথা। আইনস্টাইনকে বলা হয়েছে গণিতশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত। আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরিতে বসে তাঁকে এই যুগান্তকারী তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হয়নি। কাগজ, পেনসিল আর মাত্র একটা দূরবীন (Telescope)—এই ছিল বৈজ্ঞানিকের উপাদান। আসল গবেষণাগার ছিল তাঁর মাথার মধ্যে, মেধার মধ্যে। যেদিন আইনস্টাইনের 'রিলেটিভিটি' জন্ম নিলো সেদিন এটা বুঝবার মতো পৃথিবীতে বারো জনের বেশি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না।

এই নতুন আবিষ্কার সেদিন বিজ্ঞান জগতে যে কত বড়ো একটা বিপ্লব এনে দিয়েছিল সেটা বোঝা গিয়েছিল চল্লিশ বছর পরে যেদিন —১৯৪৫ সালের ভয়াবহ ৬ই আগস্ট তারিখে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নির্দেশে হিরোসিমার ওপর একটা পরমাণু বোমা (Atom bomb) নিক্ষেপ করে। সেই বোমার বিস্ফোরণের ফলে নিমেষকালের মধ্যে প্রায় একলক্ষ লোকের জীবননাশ ঘটেছিল, ভীষণভাবে জখম আরো একলক্ষ অধিবাসী, আর ঘর-বাড়ি ভেঙে যাওয়ার ফলে গৃহহারা হয়েছিল দু'লক্ষ মানুষ। শহরের ছয়শত ইমারত একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এরই ফলে থেমে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বিজ্ঞানীরা বলেন, গ্যালিলিওর আবিষ্কারের পরে বিজ্ঞান-জগতে নাকি এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার আর দেখা যায় নি। গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের এই যাদুকর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের এতকালের ধ্যান-ধারণা বদলিয়ে দিয়েছেন, আর উদ্বোধন করে গিয়েছেন এক নতুন পরমাণু যুগের। আইনস্টাইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার মিলিত রূপ। পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটন—পৃথিবীর এই পাঁচজন মহাবিজ্ঞানীর মতো আলবার্ট আইনস্টাইনও বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে এক নির্ভীক মহাপথিক। আপেক্ষিক তত্ত্বের পর তাঁর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব পারমাণবিক শক্তি বিকাশের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল, বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে এ সত্য আজ স্বীকৃত।

দক্ষিণ জার্মানির উল্‌ম শহরে ১৪ মার্চ, ১৮৭৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন আইনস্টাইন এক সঙ্গতিসম্পন্ন ইহুদী পরিবারে। বাবা ছিলেন এঞ্জিনীয়ার। মায়ের প্রতিভার প্রকাশ ছিল গানে—বীঠোফোনের গানে তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। মায়ের এই প্রতিভা পুত্র আইনস্টাইন পেয়েছিলেন এবং ছয় বছর বয়সেই তিনি বেহালা বাজাতে শেখেন। সেই থেকে এই মহাবিজ্ঞানীর সারাজীবনের সাথী ছিল বেহালা—বেহালা ছিল তাঁর চিত্তবিনোদনের উপকরণ। উত্তরকালে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে দর্শনেও তাঁর অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। পনর বছর বয়সেই তিনি একে একে ইউক্লিড, নিউটন ও স্পিনোজার বইগুলো পড়ে হজম করে ফেলেছিলেন। সতের বছর বয়সে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন জুরিখের একটা স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। স্নাতক হওয়ার পর একটা পেটেণ্ট অফিসে চাকরি গ্রহণ করেন আইনস্টাইন।

১৯০৫ সালে বার্লিনের একটা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ত্রিশ পাতার একটা প্রবন্ধ বেরুল। লেখক—আলবার্ট আইনস্টাইন। সেই প্রবন্ধটির মধ্যে বিজ্ঞানজগতের যে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের বার্তা নিহিত ছিল—যে আবিষ্কারের ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন ও জড় পদার্থের গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের এত কালের ধারণা আজ বদলিয়ে গিয়েছে—পনর বছর আগেও তা কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি। ১৯২০ সালে যখন ইংরেজি ভাষায় ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো তখন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানী ও গাণিতিকদের মধ্যে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল তাঁর মতবাদ। বিজ্ঞানীরা কিন্তু সহজে মেনে নিতে পারলেন না আপেক্ষিক তত্ত্ব; বললেন—অভ্রান্ত প্রমাণ চাই। সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল হিরোসিমাতে চল্লিশ বছর পরে।

॥ চার ॥

১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে য়ুরোপ যাত্রা করেন সত্যেন বোস। প্রথমে এলেন প্যারিসে। এখানে ভারতীয় ছাত্রদের একটা মেসে তিনি উঠলেন। প্যারিসে আসার অল্পদিন পরেই প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হলো। ইনিই পরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। অধ্যাপক লেভির কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে একদিন সত্যেন্দ্রনাথ দেখা করলেন বিশ্ববিশ্রুতা মাদাম কুরীর সঙ্গে। কুরী তখন বৃদ্ধা।

—তুমি যদি আমার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা করে থাক তাহলে সকলের আগে তোমাকে শিখতে হবে ফরাসী ভাষা।

—আমি ফরাসী ভাষা জানি, মাদাম।

—বেশ। তাহলে কাল থেকে আমার ল্যাবোরেটরিতে এসো।

মাদাম কুরীর ল্যাবোরেটরিতে সত্যেন্দ্রনাথ কিছুকাল তেজস্ক্রিয়তা (Radio-activity) সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাঁর একাগ্রতা ও কাজে সূক্ষ্ম কুশলতা দেখে মাদাম কুরী বিস্মিত হয়েছিলেন। প্যারিসে তিনি ছয়মাস কাল ছিলেন। এই সময় তিনি খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী

ছ ব্রোয়ীর গবেষণাগারে রঞ্জন-রশ্মি (x-ray) সম্পর্কে কিছুকাল কাজ করেছিলেন। ফ্রান্সে থাকাকালে বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ লাজভ্যাঁর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পান। প্যারিসে থাকবার সময়েই তিনি আইনস্টাইনকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, তিনি দু'বছরের ছুটি নিয়ে য়ুরোপ এসেছেন। জার্মানিতে গিয়ে তাঁর অধীনে কাজ করার খুব ইচ্ছা এবং এই বিষয়ে তিনি যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে ধন্য হবেন। এই চিঠিতে তিনি আইনস্টাইনকে আচার্য (Master) বলে সম্বোধন করেছিলেন।

যথা সময়ে চিঠির জবাব এলো। আইনস্টাইন সেই চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করার পর তাঁর এই ভারতীয় শিষ্যটিকে জানালেন সাদর আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণের সঙ্গে এই আশ্বাসও ছিল যে, অধ্যাপক বোস তাঁর অধীনে গবেষণা করার জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন। চিঠির এই অংশটুকু সেদিন সত্যেন্দ্রনাথকে যে খুবই উৎসাহিত করেছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। একমাত্র বিশেষ প্রতিভাবান গবেষক ছাড়া তাঁর কাছে কাজ করবার অধিকার সুলভ ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানসাধক নিজেই বলেছেন—

'বার্লিনে এসে একটা হোটেলে উঠলাম। সেখান থেকে ফোনে যোগাযোগ করি আইনস্টাইনের সঙ্গে। তাঁর কথায় আন্তরিকতার যে সুর বেজে উঠেছিল তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন থাকতেন পাঁচ নম্বর হ্যাবারল্যাণ্ড স্ট্রীসের একটি বাড়িতে। পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ এসে পৌঁছলাম সেখানে। দরজার কাছে একজন পরিচারিকা দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে আমার নামের কার্ডখানা দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এসে সহাস্য মুখে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে, ভেতরে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলাম তাঁর টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত বই ও কাগজপত্র রয়েছে আর এক কোণে রয়েছে তাঁর প্রিয়

বেহালাখানি। এক নজরেই দেখলাম মানুষটি প্রিয়দর্শন ; তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা মিষ্টতা ছিল যা সকলকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত। অতি সযত্নে ছাঁটা ঘন কৃষ্ণবর্ণের গোঁফ, মাথার ওপর পরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত একরাশ কালো চুল—আইনস্টাইনের চেহারাতে এই দুটিই ছিল লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধারণের মধ্যে মানুষটি যে একজন অসাধারণ এটা শুধু বুঝতে পারা যেত তাঁর আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকালে—সেই চোখের দৃষ্টিতে ছিল চিন্তার গভীরতা আর বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে একটা প্রবল ব্যগ্রতা।'

প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে তাঁদের দু'জনের মধ্যে গুরুশিষ্যের সমতুল যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় তা ১৯৫৫ সালে আইনস্টাইনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথাবার্তা হতো ফরাসী ভাষায়। আইনস্টাইন নিজে জার্মান হলেও ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন ও লিখতেন। গুরুর মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথ জার্মানিতে অনেক নামকরা বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হলেন ও অনেক কিছু দেখার সুযোগও পেলেন। বার্লিনে বিজ্ঞানীদের একটা আলোচনা চক্র ছিল ; আইনস্টাইনের চেষ্টায় তিনি সেখানকার সদস্য হতে পেরেছিলেন। গুরুর দেওয়া পরিচয়-পত্রের জোরে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এমন কি সেখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেও বিনা জমায় বই আনতে পারতেন।

১৯২৬।

ঢাকা থেকে তাঁর সতীর্থদের চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে আইনস্টাইনের একটা সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদটির জন্য একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দেন। তিনি ছিলেন শুধু এম. এস-সি- ; তাঁর কোন ডক্টরেট উপাধি ছিল না। অথচ ডক্টরেট উপাধি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়া কঠিন। তবে আইনস্টাইনের

সুপারিশের দাম অনেক। তাই ঢাকা থেকে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা সত্যেন্দ্রনাথকে চিঠিতে ঐ কথা লিখে জানিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এক আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ। কারো সুপারিশ নিয়ে তিনি বড় হবেন, এমন চিন্তা কোনদিন তাঁর মনের মধ্যে স্থান পায় নি। নিজের যোগ্যতার ওপর ছিল তাঁর আস্থা। তাই আইনস্টাইনের কাছে এই প্রস্তাব তুলতে তিনি প্রথমটায় খুবই সংকোচ বোধ করেছিলেন। তারপর একদিন সকালবেলায় সংকোচের জড়তা কাটিয়ে যখন তিনি সুপারিশের কথাটা তুললেন, তখন সেই বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ খুব আশ্চর্য বোধ করেন। বললেন—'তুমি বিজ্ঞানের যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছ সেগুলো কি তোমার যোগ্যতার পরিচায়ক নয়?' পরে অবশ্য তিনি শিষ্যকে একটি সুন্দর প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন।

১৯২৭

সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে তিনি দেশে ফিরলেন। খ্যাতি তাঁর চলেছে আগে আগে। য়ুরোপে থাকতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদটির জন্য যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক বিজ্ঞানীর সই করা একটি প্রশংসাপত্র, যাতে লেখা ছিল—'আমরা সবাই প্রোফেসর বোসের উপস্থিতিতে উপকৃত হয়েছি।' নিঃসন্দেহে দশটা ডক্টরেট উপাধির সমান ছিল এই একটি কথা। তিনিই নিযুক্ত হলেন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (Dean)। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকে ঢাকা হলের Provost বা সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

উনিশ শো সাতাশ থেকে আঠার বছর ধরে তিনি ঢাকায় কাটালেন। এই সময়টাই ছিল তাঁর অধ্যাপক-জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। তাঁর ছাত্ররা বলতেন যে সত্যেন্দ্রনাথের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগটি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল।

পদার্থবিজ্ঞানের নবীন ছাত্রদের মধ্যে দেখা দেয় নতুন উদ্দীপনা, চলতে থাকে কতো বিষয়ে উন্নত ধরনের গবেষণা। তাঁর সময়েই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। এমন কি ভারতের বাইরে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে। অধ্যাপক হিসাবে এ তাঁর কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। বস্তুত আচার্য হিসাবে এই আঠারো বছর সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর বিভাগে এক বিরাট কর্ম-প্রবাহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সত্যিকার গবেষণা স্পৃহা।

১৯২৭ সাল থেকেই 'সত্যেন বোস' এই নামটি ভারতবর্ষের বিজ্ঞানজগতে শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে, উচ্চারিত হতে থাকে। শুধু বিজ্ঞানীদের সমাজে নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আসরেও তিনি স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। সে কথা পরে বলব। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানরূপে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি ও তরুণ গবেষকদের পরিচালনা করবার পদ্ধতি তখন সারা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদগ্ধ মহলে তখন আলোচিত হতো তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা। 'সত্যেন বোস' নামটি তখন যেন সর্বত্র একটা বিস্ময়ের উদ্রেক করত। এর মূলে ছিল য়ুরোপের এক মহাবিজ্ঞানী কর্তৃক তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি। যেখানেই আপেক্ষিক তত্ত্ব আলোচিত হতো সেখানেই উদ্ভাবকের নামের সঙ্গে সত্যেন বোসের নামও উচ্চারিত হতো। এ কি কম গৌরবের কথা!

ঐ আঠারো বছর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান—এই দুই কাজের দায়িত্ব তিনি যেভাবে সম্পন্ন করেছিলেন তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেন। এইভাবে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ এখানে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা করার পর চলে আসেন তাঁর জন্মভূমি কলকাতায়।

ঢাকায় থাকার সময়ে ১৯২৯ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি পদে এবং ১৯৪৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনের মূল সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে "কোয়াণ্টামবাদের" প্রতি হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা প্রকাশ ও তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আলোচনা করেন। তাতে দেখা যায় জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের দিক থেকে বসুর মতামত বোর হাইসেনবার্গের চেয়ে আইনস্টাইনের নিকটতর।

ঢাকায় দীর্ঘ আঠারো বছর অবস্থানকালে সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষকতা ও গবেষণার বাইরেও নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। তিনি সেখানে একটি বৈঠকী সভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভার নাম ছিল "বারো-জনা"। সভার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ও অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পালাক্রমে সভ্যদের বাড়ীতে এই সভা অনুষ্ঠিত হতো। এই সভার উল্লেখযোগ্য সদস্যরা ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, আর্থার হিউজ, অন্নদাশঙ্কর রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, সর্বাণীসহায় গুহ-সরকার, মামুদ হোসেন প্রমুখ। সত্যেন্দ্রনাথের এই বারোজনা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—ত্রিশ বছর আগে আমি ঢাকায় বদলি হই। আলাপ করতে আসেন এক ভদ্রলোক। বলেন, বারোজনের একটি মণ্ডলী গঠন করা হবে। আমি তাঁদের একজন হতে রাজী কি না? তালিকাতে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের নাম। আমি তার এক জায়গায় নিজের নাম দেখে ভাগ্যবান মনে করি। রাজী না হয়ে পারি?...ভদ্রলোক বললেন, বারো জনের বাড়ী বারো মাসে বারোটা বৈঠক হবে।..."বারোজনা" ছিল আমাদের মিলনভূমি। নইলে অতবড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে উদীয়মান সাহিত্যিকের মিল্‌বে কোন্ সূত্রে?

বিজ্ঞানের সাধনা ব্যক্তির নয়, জাতির ; জাতির নয়, সমগ্র মানব সমাজের। এই আদর্শকে সামনে রেখেছিলেন জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর এই দু'জন আচার্যের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেই সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯৪৫ সালে শুরু হয় তাঁর শিক্ষক জীবনের আর একটি অধ্যায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের 'খয়রা অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। এখানে তিনি বারো বছর কাল অধ্যাপনা করেন। মামুলি অধ্যাপনা নয় ; তাঁর তখনকার ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে বিজ্ঞানানুশীলনে এক প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন তিনি। কি রসায়নবিদ্যা, কি পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা দরকার হলেই তাঁর কাছে আসতেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের সহায়তাদানে কিছুমাত্র কার্পণ্য করতেন না।

শিক্ষক হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি গতানুগতিক-ভাবে পাঠক্রম বা সিলেবাস অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের কোনদিন শিক্ষা দিতেন না। সত্যসন্ধানী সত্যেন্দ্রনাথ চাইতেন—তাঁর ছাত্রছাত্রীরা তাদের জ্ঞানের পরিধি শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর মধ্যেই যেন বেঁধে না রাখে। তিনি যথার্থ আচার্যের মতো তাদের মনে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিতেন। যাতে তারা কেতাবী রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তহীন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের প্রেরণা পায়। কলকাতায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে তিনি বাংলা ভাষাতেই পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতেন। খুব জটিল বিষয়গুলিও তিনি বাংলায় এমন সরল ও সহজভাবে ব্যক্ত করতেন যে তা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হতো না। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক ছাত্রী বলেছেন, 'যে জটিল তত্ত্বকথা আমাদের কাছে খুব নীরস বলে মনে হতো, তা আচার্য বসুর মাতৃভাষায় আলোচনার প্রসাদগুণে প্রাঞ্জল ও সরস হয়ে উঠত।'

শিক্ষক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের আরো একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই তিনি সেদিন ছাত্রমহলে অমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আচার্য পি সি রায়ের পর বোধ করি সত্যেন বোসই সেদিন ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মাঝে একটা কোমল অনুভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিভূত হতো। তাঁর কাছে তারা যে শুধু ছাত্রছাত্রী তা নয়, প্রত্যেকেই যেন তাঁর অত্যন্ত আপনজনের একজন। তিনি নিজের থেকেই প্রত্যেকের পারিবারিক জীবনের খোঁজখবর নিতেন। নিজে অসামান্য হলেও সত্যেন্দ্রনাথ এসেছিলেন একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, তাই ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যজীবনের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি ছিলেন সমবেদনশীল। তাদের সবরকম সহায়তা করতে তিনি এগিয়ে আসতেন। এই সংবেদনশীল হৃদয়ই একদা বিপুল ছাত্র ও গবেষকগোষ্ঠীকে তাঁর প্রতি এমনভাবে 'আকৃষ্ট করেছিল। এযুগের ছাত্রজীবনের কাছে তিনি যেন দ্বিতীয় পি. সি. রায় হয়ে উঠেছিলেন।

গবেষক ছাত্রছাত্রীদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্ঞানরাজ্যের রত্নাকর। তারা জানে জ্ঞানরাজ্যের সকল রত্নের সন্ধান মেলে তাঁর কাছে—বিশ্বপ্রকৃতির সকল রহস্য সমাধানে তিনি সহায়ক। বিজ্ঞানের সকল শাখার অগ্রগতির সঙ্গে যাঁদের সম্যক পরিচয় থাকে তাঁদেরই বলা হয় প্রকৃত বিজ্ঞানী। সত্যেন বোস ছিলেন এই শ্রেণীর বিজ্ঞানী। তিনি যখন বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করতেন তখন তিনি অসীম আগ্রহ নিয়ে যেমন গণিত গবেষককে সহায়তা করতেন, তেমনি আবার রসায়ন অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর সঙ্গে সমান আগ্রহের সঙ্গে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর এক ছাত্রের মুখে শুনেছি, প্রোফেসর বোসের মতো বিজ্ঞানের এত বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক ও গভীর পরিচিতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন ছিলেন তখন একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। একদিন কয়েকজন ছাত্রনেতা তাঁর কাছে এসে আবেদন করল যে, একমাস কি দু'মাসের জন্য এম. এস-সি পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে দিতে হবে।

—কিন্তু তোমাদের এই দাবীর কোন যৌক্তিকতা দেখছিনে।

—পরীক্ষা পিছিয়ে দিতেই হবে আপনাকে।

—না।

—আমরা তাহলে অনশন করব, স্যার।

—তোমরা যদি এইভাবে একটা অযৌক্তিক অনুরোধ মেনে নিতে আমাকে বাধ্য করাও, তাহলে আমি বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দেব।

ছেলেরা তাদের দাবী প্রত্যাহার করে নিলো। কারণ সত্যেন বোস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যাবেন ছাত্রদের কাছে এটা ছিল অভাবনীয়। এই ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'আমার ঐ একটা কথাতেই কাজ হয়েছিল।'

সত্যেন্দ্রনাথ যদিও প্রধানত ছিলেন একজন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী (Theoretical scientist) তথাপি পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। হাতেকলমে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি একাই পদার্থবিজ্ঞানের একটা ল্যাবোরেটরি পরিচালনা করতে পারতেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে সম্মানের সঙ্গে খয়রা অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সত্যেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন। এই বছরেই তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ মেঘনাদ সাহার মৃত্যু হয়।

১৯৫৬ সালটি এই বিজ্ঞান সাধকের জীবনে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরেই তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। প্রায় চল্লিশ বছর কাল সগৌরবে শিক্ষকতা

করার পর, বাষট্টি বছর বয়সে যখন তাঁর বিশ্রাম নেবার সময় তখন তিনি গ্রহণ করলেন এই দায়িত্বজনক পদ। এর থেকেই বোঝা যায় কিরকম প্রচণ্ড কর্মশক্তির আধার ছিলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ যে দু'বছর বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ সময় তিনি এখানকার নানা বিভাগে অনেক সংস্কার পরিবর্তন করেন। যার ফলে এই শিক্ষায়তনটির অনেক উন্নতি পরলক্ষিত হয়। শিক্ষক হিসাবে যেমন তাঁর যোগ্যতা ছিল, তেমনি একটি বৃহৎ শিক্ষায়তনের পরিচালনাতেও তিনি সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

এই বছরে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কেবলমাত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তিনি এই উপলক্ষ্যে যথাসময়ে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৯৫৭ সালটিও তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথকে সম্মানিত ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে অনুরূপভাবে সম্মানিত করে। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন ১৯৫৪ সালে। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার চরম স্বীকৃতি এলো ১৯৫৮ সালে যখন ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে 'ফেলো' (Fellow) মনোনীত করেন। এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। এর তিন বছর পরে, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে ডক্টরেট ও দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করেন।

জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগেই নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি বিজ্ঞান কলেজের মূল ভবনের একতলায় তাঁর ঘরটিতে নিজের গবেষণার কাজ নিয়েই

থাকতেন। তবে শুধু তাঁর নিজের গবেষণা নয়, দেশের নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকল্পে ও বিজ্ঞান প্রগতির নানা কাজে তাঁকে যোগদান করতে হতো। এ ছাড়া, বিজ্ঞান সংক্রান্ত আরো কত শত ব্যাপারে কতজন ও কত প্রতিষ্ঠান যে প্রতিদিন তাঁর কাছে আসত তার হিসাবনিকাশ ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবন নানা সম্মানে পরিপূর্ণ। তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের মহত্ত্বে উদাসীন এই সহজ সরল মানুষটি নিজে কোনদিন সম্মানের জন্য লালায়িত হন নি অথবা দেশ-বিদেশের কাছ থেকে বহু রকম সম্মান লাভে কখনো বিন্দুমাত্র গর্ববোধ করেন নি। খ্যাতি সম্পর্কে তাঁর মতো নিস্পৃহ মানুষ খুব কমই দেখা গিয়েছে। দেশের গৌরবই ছিল তাঁর কাছে বড়ো। তাই দেশকে সামনে রেখে তিনি বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর সেবা করতেন নিস্পৃহ ভাবে। বিদেশী বৈজ্ঞানিক সংস্থার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে অনেকবার এবং ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ বহুবার বিদেশে গিয়েছেন। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক পরিগণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার জন্য ইউনেসকোর[১] উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় ভারত থেকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত হন। সে সময় তিনি প্যারিস সম্মেলন শেষ হবার পর ইংলণ্ড ও জার্মানি ভ্রমণ করেন ও সেই দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মিলিত হন। ১৯৫৩ সালে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আমন্ত্রণে তিনি বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন।

তিনি যখন শান্তি কংগ্রেসে যোগদান করতে যান তখন বুদাপেস্টে থাকবার সময়েই ডেনমার্ক, চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমন্ত্রিত হয়ে ঐসব দেশের আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের কাজ পরিদর্শন করে আসেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বুদাপেস্টে

১। UNESCO-রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা।

যাবার পথে ফ্রান্সের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে সম্মানিত করেন ও ফরাসী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এই সময়েই তিনি কোপেনহেগেন ও জুরিখ গিয়ে সেখানে যথাক্রমে প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক নীলস বোর ও অধ্যাপক পাউলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৫৫ সালে ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংসদের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি আবার প্যারিস যান। সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরে আপেক্ষিকতাবাদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আহূত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯০৫ সালে এই বার্ন শহরে পেটেণ্ট অফিসে চাকরি করতে করতে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রকাশ করেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আয়োজিত এই স্মরণীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তত্ত্বের উদ্ভাবকের যোগদানের কথা ছিল। এই উপলক্ষে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এই আকাঙ্ক্ষায় শিষ্য এই সম্মেলনে যোগদানে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই ১৮ এপ্রিল আইনস্টাইনের জীবনদীপ নিভে যায়।

এর পরেও তিনি আরো কয়েকবার নিমন্ত্রিত হয়ে বিদেশ গিয়েছেন। ১৯৬২ সালে তিনি জাপানে যান। ঐ বছরের অগস্ট মাসের গোড়ায় জাপানের টোকিও শহরে নাগাসাকি ও হিরোসিমার ওপর পরমাণু বোমা বর্ষণের স্মরণে 'হিরোসিমা নাগাসাকি' দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক 'বিজ্ঞান' ও 'দর্শন' সম্মেলনে যোগদানের জন্য টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান সমিতি সত্যেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি জাপানে গিয়েছিলেন। সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগতির পরিচয় লাভের জন্য তিনি

জাপানের নানা জায়গা ও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। একমাত্র জগদীশচন্দ্র বসু ছাড়া, ভারতবর্ষের আর কোন বৈজ্ঞানিক বিদেশের একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এইভাবে নিমন্ত্রণ লাভ করেন নি।

অধ্যাপনা ও বিশ্বভারতীর কাছ থেকে অবসর নেবার পর সত্যেন্দ্রনাথ আলস্যে দিন কাটান নি বা বিশ্রাম সুখ ভোগ করেন নি। ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্য তাঁর ডাক আসত। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অধ্যাপক বসুর এই ভাষণ শিক্ষিত মহলে ও পত্র-পত্রিকায় বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তাঁর এই মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আলোচনা হয়। পরের বছর রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণেও তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি স্মারক বক্তৃতাও প্রদান করেছেন। তাঁর এইসব বক্তৃতা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন সত্যেন্দ্রনাথের কোন বক্তৃতাই মামুলি ছিল না—সেগুলির প্রত্যেকটিতেই থাকত চিন্তার খোরাক। এই বিজ্ঞান সাধক তাঁর সময়ের একজন বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষও ছিলেন এবং ভারতের বৃহত্তর জন-জীবনকে তাঁর চিন্তা স্পর্শ করেছিল। এইখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা।
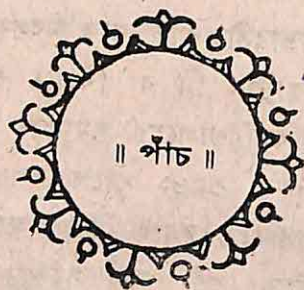
বিজ্ঞানের সাধনায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন একটি বহুমুখী প্রতিভা।

বিজ্ঞানের অনুশীলনে এর কোন বিশেষ একটি শাখার মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাইতেন না। রসায়নে যেমন, তেমনি জীববিদ্যা, নৃ-তত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা এমন কি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে এই বিজ্ঞানসাধকের ছিল সমান অনুসন্ধিৎসা আর আগ্রহ।

প্রকৃত বিজ্ঞানী কাকে বলে?

বসুবিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শন করতে এসে বিখ্যাত ইংরেজ-লেখক আলডুস হাক্সলে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন। উত্তরে জগদীশচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—'বিজ্ঞানের সকল বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে যিনি ওয়াকিবহাল তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞানী—তিনি কোন একটি শাখার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন না।'

আচার্য সত্যেন বোস ঠিক এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি যখন বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করতেন তখন সতীর্থ ও ছাত্ররা এর পরিচয় পেয়ে যার পর নাই বিস্মিত হতেন। সেখানে থাকাকালে তাঁকে যেমন দেখা গিয়েছে অসীম আগ্রহ নিয়ে গণিতের একজন গবেষককে সহায়তা করতে, তেমন আবার রসায়ন গবেষণায় নিরত

ছাত্রদের সঙ্গেও গবেষণাগারের কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা যেত। আবার দেখা গেছে উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের সঙ্গে সমান আগ্রহে তিনি আলোচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরও উপদেশ দিতে তিনি সমানভাবেই আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁরই এক ছাত্র বলেছেন—'আমরা দেখেছি, প্রফেসর বোস সায়ান্স কলেজে যখন গণিতের কোন একটা দুরূহ সমস্যা সমাধানে আত্মস্থ থাকতেন, তখন আমাদের মনে হতো গণিতই বুঝি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। বস্তুত তাঁর মতো বিজ্ঞানের এত বিভিন্ন শাখায় এমন ব্যাপক ও গভীর পরিচিতি, এমন আগ্রহ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না।'

তাঁর পূর্বসূরী জগদীশচন্দ্রের মতো সত্যেন্দ্রনাথ গবেষণার জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি উদ্ভাবনায় ছিলেন পারদর্শী। তাঁর এক ছাত্র লিখেছেন—'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সায়ান্স কলেজে যোগদানের পর আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের মতো তরুণ গবেষকদের যন্ত্রপাতি নির্মাণে উৎসাহিত করতেন, আর বলতেন, তোদের যন্ত্রপাতি তোরা নিজেরাই পরিকল্পনা করে নিজেরাই বানিয়ে নিবি। আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম, তখনকার ল্যাবোরেটরিতে যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। হাতে-কলমে ছোটখাটো যন্ত্র কেমন করে তৈরি করতে হয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের তা শেখাতেন। আমরা দেখতাম এসব বিষয়ে তাঁর নিজেরও খুব দক্ষতা ছিল। স্যর জে. সি. বোসও তাঁর নিজের এক্সপেরিমেন্টের জন্য অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিজেই তৈরি করে নিতেন।'

দেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ সুগম করবার জন্য ভারত সরকার কয়েকটি ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরি বা জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হওয়া খুবই দরকার, কারণ এর ফলে তরুণ গবেষকদের

নিরুদ্বেগে গবেষণায় লিপ্ত থাকার অনেক সুবিধা হবে। তবে এইসব গবেষণাগারকে সুসজ্জিত করে তোলার জন্য যেসব যন্ত্রপাতির দরকার সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানী না করে আমাদের দেশেই তৈরি করার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে তিনি পরমুখাপেক্ষিতা একেবারেই পছন্দ করতেন না।'

বিজ্ঞান জগতে তিনি কি দিয়ে গেছেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, বোস সংখ্যায়ন বা Bose statistcs-এর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসাধনা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞানের সর্বত্রই তাঁর উদ্ভাবিত বোস সংখ্যায়নের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর এই তত্ত্বকে অবলম্বন করেই পৃথিবীতে পাঁচজন পদার্থবিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন, অথচ এর উদ্ভাবককে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়নি। বোস সংখ্যায়ন বিজ্ঞানজগতের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—এ তথ্য আজ বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত।

আবিষ্কারের ইতিহাসে চিরন্তন অমরতা লাভ করেছেন সত্যেন বোস তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বটির জন্য, যেমন অমরতা লাভ করেছেন আচার্য রামন তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বের জন্য।[১] সবচেয়ে বড়ো কথা, বোস সংখ্যায়ন তত্ত্বের জন্য এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে 'সত্যেন বোস' এই নামটিও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। হবেও চিরকাল। এখানে একটা কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়। স্বীয় প্রতিভাবলে সত্যেন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই তুলনায় তাঁর নিজের দেশে উপযুক্ত মহল থেকে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন অনেক দেরীতে।

১। 'Raman Effect'—এই হলো চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের আবিষ্কৃত তত্ত্ব। এর জন্য ১৯৩০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারি এই বিজ্ঞানসাধক আশি বছরে পদার্পণ করেন। এর ঠিক এক সপ্তাহকাল পরেই বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংখ্যায়ন জগতের অন্যতম দিক্‌পাল ডক্টর ডিরাক এক বার্তায় জানালেন—'অধ্যাপক বসুর এই আবিষ্কার আধুনিক পরমাণু তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতবর্ষ এই অসাধারণ বিজ্ঞানীর জন্য গর্বিত।' মোট কথা, বর্তমান যুগে যেসব মূলগত (Fundamental) তত্ত্ব বিজ্ঞানে গ্রথিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে মৌলিকতায়, গুরুত্বে ও গভীরতায় তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় (Theoretical physics) বোস সংখ্যায়ন নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এইটি দেখেই তো ১৯২৪ সালে বিস্মিত হয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন—'আমার মতে প্ল্যাঙ্কের সূত্রের (Law) ওপর বোসের কাজ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় একটি অভিনব সংযোজন।'

বিজ্ঞান জগতে একটা নতুন তত্ত্বের জন্ম হলো।
ঘটলো একটা নতুন প্রতিভার আবির্ভাব।
সেই তত্ত্ব—বোস সংখ্যায়ন !
সেই প্রতিভা—সত্যেন বোস।

নিউটনের সময় থেকে পদার্থবিদ্যা যে ধারায় চলে আসছিল তার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংশয় দেখা দিতে থাকে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ্ জীনস্-এর চিন্তা সনাতনী পদার্থবিদ্যার কাঠামো নাড়িয়ে দিল। তারপর জন্ম নিল প্লাঙ্ক প্রকল্প ও কোয়াণ্টামবাদ।[১] পদার্থবিদ্যা তার এতদিনের সনাতনী খোলস ছেড়ে একেবারে আধুনিকতায় বিমণ্ডিত হয়ে উঠল। পৃথিবীতে এলো নতুন পদার্থবিদ্যা জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের (১৮৮৪-১৯৭৪) একটি সূত্র ধরে। আইনস্টাইন বলতেন, প্ল্যাঙ্ক সাধারণ বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী। তিনিই কোয়াণ্টামবাদের প্রবর্তক। এরই আধুনিক গাণিতিক রূপ

১। Quanta শক্তি-কণিকা বা শক্তিগুচ্ছ।

হলো কোয়াণ্টাম গতি-বিজ্ঞান। প্ল্যাঙ্কসূত্র থেকে পাওয়া গেল 'কোয়াণ্টাম সংখ্যায়ন।' পরবর্তীকালে এই কোয়াণ্টামবাদ ও কোয়াণ্টাম সংখ্যায়নের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা অণু জগতের নতুন নতুন রহস্যের সন্ধান ও সূক্ষ্ম জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন ও এখনো করছেন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯১৮ সালে প্ল্যাঙ্ককে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তারপর আইনস্টাইন, রাদার ফোর্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণার ভেতর দিয়ে প্ল্যাঙ্কের আবিষ্কার পরিণতি লাভ করে কোয়াণ্টামবাদের মধ্যে।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছিল যে 'কোয়াণ্টামাবাদ', সেই জিনিসটা কি? শক্তির পরিবর্তন হয় না—এই কথা এতকাল ধরে বলে এসেছে সনাতনী পদার্থবিদ্যা। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে পরবর্তিত হয় অণুজগতে; এইকথা বলা হলো কোয়াণ্টামবাদে। নিউটন ও তাঁর অনুগামীরা মনে করতেন আলোর কণা আছে ও তাদের গতি থেকেই আলো বিস্তার লাভ করে। প্রায় একই সময়ে বিজ্ঞানী হাইগেন্স বললেন—আলো হচ্ছে তরঙ্গ (wave)-বিশেষ। তারপর দু'শো বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর সিদ্ধান্ত স্বীকৃতি লাভ করে। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বক (Electro-magnetic)-তত্ত্বও আলোর তরঙ্গরূপের ধারণার সমর্থন করে। আবার প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন প্রভৃতির ঘোষণা থেকে জানা গেল যে, আলোর কণারূপও আছে। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি পদার্থকণিকার নাম মিলিয়ে আলোর কণিকার নাম দেওয়া হলো ফোটন (Photon)।

আলোর এই যে দু'রকম প্রকৃতি—কণারূপ ও তরঙ্গরূপ—আজ বিজ্ঞানজগতে স্বীকৃত। একেই মূল কথা হিসাবে গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে কোয়াণ্টাম গতিবিজ্ঞান। কোয়াণ্টামবাদই যুক্তিসহ সুসঙ্গত রূপ নিয়ে পরিণতি লাভ করেছে কোয়াণ্টাম গতিবিজ্ঞানে। বিজ্ঞানের যে শাখায় মৌলিক কণিকাদের সমবায়ের প্রকৃতি ও চরিত্র হিসাব করা যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে কোয়াণ্টাম সংখ্যায়ন (Quantum

Statistcs)। এইভাবে বিজ্ঞানজগতে এতকাল ধরে যে সিদ্ধান্তটি স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়ে আসছিল তার সম্পূর্ণ বিরোধী সিদ্ধান্ত স্থাপন করে ম্যাক্সি প্ল্যাঙ্ক পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। আর প্ল্যাঙ্কের সূত্রটিকেই নানাভাবে প্রমাণ করেন ডেবাই এবং আইনস্টাইন। তবে একমাত্র আইনস্টাইন এতকালকার তাত্ত্বিক আচার-পুষ্ট প্ল্যাঙ্ক সূত্রকে আচারনিষ্ঠ করে দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু তা ঠিক মতো হলো না। এইখানেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোসের প্রতিভা এক অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছিল। ১৯২৪ সালে প্ল্যাঙ্ক সূত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অঙ্কপাত করলেন তা ছিল একেবারে ত্রুটিমুক্ত। তখন আইনস্টাইন ও সমকালীন অন্যান্য পদার্থবিদ্‌গণ তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন এবং একবাক্যে তাঁর জয় ঘোষণা করলেন। এইভাবে সেদিন বিজ্ঞান-জগতে একটি নতুন প্রতিভার অভ্যুদয় ঘোষিত হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ নামটা ওদেশের বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন নি। কারণ সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরিত গবেষণা নিবন্ধটি[১] প্রকাশকালে আইনস্টাইন তাঁর পুরো নামটা জানতেন না। তাই তিনি তাঁর মন্তব্যে শুধু 'বোস' বলেই উল্লেখ করেছিলেন। অধ্যাপক বোসের অবশ্য প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্ল্যাঙ্ক সূত্র প্রতিষ্ঠা। তাঁর গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আইনস্টাইনের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নি।

আগেই বলা হয়েছে, প্ল্যাঙ্ক নিজে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর সূত্র প্রমাণ করেছিলেন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা আদৌ ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এমন কি, সেই সূত্রকে যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে স্বয়ং আইনস্টাইনও সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারেন নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই সত্যেন্দ্রনাথ সেদিন (১৯২৪) তাঁর উদ্ভাবিত এক অভিনব ও সুসঙ্গত পদ্ধতিতে প্ল্যাঙ্ক সূত্রের প্রমাণ দিয়ে শুধু

১। Planck's Law and Light quantum hypothesis—এই ছিল নিবন্ধটির নাম।

আইনস্টাইনের মতো একজন মহাবিজ্ঞানীকে নয়, সমস্ত বিজ্ঞান জগতকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন—যেমন এর আগে উদ্ভিদের প্রাণ আছে প্রমাণ করে য়ুরোপের বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান ভারতের হৃত গৌরবকে বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় প্রতিষ্ঠিত করেন রামানুজম, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও রামন প্রভৃতি বিজ্ঞানসাধকগণ। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিভার মৌলিক অবদানে বিজ্ঞানজগতে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসব স্মরণীয় পথিকৃৎদের নামের সঙ্গে পরবর্তীকালে যে কয়জন তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর নাম যুক্ত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও বিশিষ্টতম ছিলেন সত্যেন বোস। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর যখন তিনি য়ুরোপের বিজ্ঞানজগতে স্বীয় নামকে মুদ্রাঙ্কিত করে দিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় তাঁর জন্মভূমির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর গুরু আইনস্টাইন তো মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কার করেছিলেন। বয়স দিয়ে প্রতিভার পরিমাপ হয় না, এ যেমন সত্য, তেমনি প্রতিভা-ই ঠিকভাবে বুঝতে পারে প্রতিভাকে। আইস্টাইন না হলে সত্যেন বোসের প্রতিভা কে-ই বা বুঝতে পারত ?

একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীর মতে 'সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তা আধুনিক পদার্থবিদ্যার সকল স্তরেই প্রসারিত হতে দেখা যায়। আজকের এই পদার্থবিদ্যার ইমারত দাঁড়িয়ে আছে বোস সংখ্যায়নের স্তম্ভের ওপর। তাঁর এই অবদানের গুরুত্ব এমনই অপরিসীম যে তাঁর উদ্ভাবিত বোস কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন।' এই অভিমতের মধ্যে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। বাস্তবিক আজ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বোস সংখ্যায়নের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আধুনিক পদার্থবিদ্যার এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

অনেকে ক্ষোভের সঙ্গে বলে থাকেন যে, ১৯২৪ সালে বোস

সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করার পর সত্যেন্দ্রনাথ আর কোন মৌলিক গবেষণায় হস্তক্ষেপ করেন নি। কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। আসলে আমরাই এই বিজ্ঞানসাধকের গবেষণার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সচেতন নই। কেবলমাত্র একটি শাখাতেই তিনি তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। 'বোস সংখ্যায়ন' ভিন্ন তাঁর অন্যান্য অনেক গবেষণাই আজ বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত। ১৯১০ সালে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর গবেষণা—যা সাহা-বোস ইক্যুয়েশন অব স্টেট নামে পরিচিত—এক সময়ে বিজ্ঞানীমহলে আলোড়ন এনেছিল। ১৯১৯-২০ সালে ও ১৯৩৯ সালে তিনি যথাক্রমে "বস্তু অভ্যন্তরিক বল সাম্যের সমীকরণ" ও কোয়াণ্টামবাদের একটি গাণিতিক সমাধান সম্পর্কে ছুটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে কৃস্ট্যালতত্ত্ব নিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। তোমরা বড়ো হয়ে বিজ্ঞানাচার্যের বহুমুখী গবেষণার কথা আরো ভালো করে জানবে। তিনি যেমন ছিলেন গাণিতিক ও তত্ত্বীয়-বিজ্ঞানী, তেমনি পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু নিজের প্রতিভা সম্পর্কে তিনি ছিলেন একেবারেই উদাসীন। তাঁর আদর্শই ছিল—'আমারে যেন না করি প্রচার, আমার আপন কাজে।' এইখানেই এই বিজ্ঞান-সাধকের মহত্ত্ব।

॥ ছয় ॥
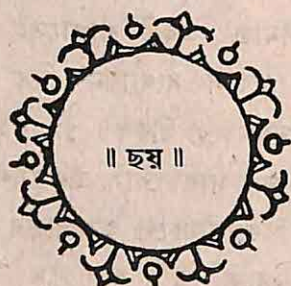
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়—মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস। এইবার আমরা এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রেরণাটা তিনি পেয়েছিলেন কোথা থেকে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'এই বিষয়ে আমি প্রেরণা পেয়েছি চারজনের কাছ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—এঁরাই আমাকে এই দিকে পথ দেখিয়েছিলেন। আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গে বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি পড়ি তখন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাংলাকে বৈজ্ঞানিক করতে হলে, বাঙালীকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শেখাতে হবে—বঙ্কিমবাবুর এই কথা কয়টি আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। ১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার সময় আগাগোড়াই বাংলায় যে উদ্বোধনী ভাষণটি রচনা করে পাঠ করেছিলেন তিনি তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'নিবেদন'। তাঁর সেই বক্তৃতা আমাকে এইদিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই আমাদের দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি বলতেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে ও বিজ্ঞানচর্চা না করলে বাঙালীকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা

যাবে না। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেই আমি এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম যে, আমাদের মাতৃভাষাকে উচ্চতর বিজ্ঞান আলোচনার বাহন করবার জন্য আমি আত্মনিয়োগ করব। আমার দু'জন শিক্ষকই—জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র—এই ভাবের ভাবুক ছিলেন।'

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের গুরুত্ব সত্যেন্দ্রনাথ বরাবরই উপলব্ধি করতেন আর তিনি যা উপলব্ধি করতেন তা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য প্রয়াস পেতেন। তাঁর সেই প্রয়াসের ফল—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। এই-ই তাঁর অক্ষয় কীর্তি। সাতাত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বিজ্ঞান বিষয়ে একটি বই। নাম—বিশ্বপরিচয়। অতুলনীয় এই বইটি তিনি উৎসর্গ করলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে। এই বইটি যখন লেখা হয় (১৯৩৭) তখন কবি ছিলেন উত্তর প্রদেশের আলমোড়া শহরে আর সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রাশিকৃত বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করে সহজবোধ্য ভাষায় লেখা 'বিশ্বপরিচয়' বইটি রবীন্দ্র প্রতিভার এক আশ্চর্য দান বলে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত হয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। বাংলায় বিজ্ঞানের বই তিনি কেন লিখলেন সেই কথাটা কবি দীর্ঘ উৎসর্গ-পত্রে সুন্দরভাবে বলেছেন। এই বই লেখা হলে এর পাণ্ডুলিপি দেখে দেবার জন্য কবি অনুরোধ করেন সত্যেন্দ্রনাথকে। তিনি রাজী হননি, বলেছিলেন—'আপনি বাংলায় বিজ্ঞানের বই লিখেছেন। এই-ই আমাদের ভাগ্য! আপনার লেখা আমি কি দেখব?'

'বিশ্বপরিচয়' বইটি রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানীর নামের সঙ্গে যুক্ত করে বইটির মুখবন্ধে লিখেছিলেন—

"এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞান সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার-প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না।

কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমত নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাইহোক, আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন, তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।

শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।...

আমার কৈফিয়ৎটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হচ্ছে, তা হলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।”...এজন্য সত্যেন্দ্রনাথের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এই কথা তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তার উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—‘কি জানো, সত্যি কথা বলতে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেও আমি অতটা কৃতার্থ বোধ করতাম না যেমনটি বোধ করেছিলাম সেদিন কবির এই স্নেহের দান লাভ করে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা আমি এই বইটা পড়ে আমার মনের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড প্রেরণা লাভ করেছিলাম। জীবনের গোড়া থেকেই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করেছিলাম, কবির স্নেহমণ্ডিত এই উপহার লাভ করে আমি আমার আজীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে কৃতসংকল্প হই।’ এর এক দশক কাল পরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করে বিজ্ঞানী তাঁর যৌবনের সংকল্প চরিতার্থ করেন।

তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ পোষণ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রীতির কথা তাঁর অগ্রজ বন্ধু পশুপতি ভট্টাচার্য এইভাবে বলেছেন—“আমাদের সেই ছাতের আড্ডাতে গান ও

সাহিত্যচর্চা খুবই জমে উঠেছিল। তখন সকলে মিলে ঠিক করা হ'লো যে নিজেদের মধ্যে একটা হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা বের করতে হবে। সত্যেন বসু হবেন তার সম্পাদক। সেই পত্রিকার নাম দেওয়া হলো "মনীষা"। এ নাম সত্যেনেরই দেওয়া। আমরাই তাতে লিখতাম, কেউ প্রবন্ধ, কেউ গল্প, কেউ কবিতা। কিন্তু স্বয়ং সম্পাদকেরও তো কিছু লেখা চাই। সত্যেন বললেন, আমি একটা গল্প লিখছি। সেই গল্পের নাম হলো "সে"। সে যে কে, তার পুরো রহস্যটা লেখক ভাঙলেন না। কেবল বললেন তাকে চিনেছি, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তাকে ধরবার জন্য আমি গভীর অরণ্যের মধ্যে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি, কখনো রোদে, কখনো ছায়াতে, কখনো অন্ধকারে, তার পায়ের চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, কখনো কখনো গলাও পাচ্ছি, তাকে ধরবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরতে পারছি না। এই গল্পই চলল পাতার পর পাতা, আর মাঝে মাঝে অরণ্য প্রকৃতির কত বিচিত্র বর্ণনা। পড়লে মনে হতো, পাকা একজন কোনো সাহিত্যিকের লেখা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গল্প সমাপ্ত হয় নি। কারণ মাত্র তিন মাস বেরিয়েই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। অতএব লেখক তাঁর মনের মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা এবং কাকেই বা খুঁজেছিলেন তা কিছু জানা গেল না। এতদিনে পেয়েছেন নিশ্চয় তাঁর খোঁজার বস্তু, অন্তত সবাই তাই বলে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না।"

যতই এই অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে তিনি ততই যেন অনুভব করেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা। তিনি অনেকদিন থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলা ভাষায় পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তখন রাজশেখর বসু মহাশয়ের সহায়তায় তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের কিছু পরিভাষাও তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকায় যখন অধ্যাপনা করতেন তখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। সেই

চেষ্টার ফল—'বিজ্ঞান পরিচয়'। এটি ছিল দ্বি-মাসিক পত্রিকা। তাঁর অনেক সতীর্থকে দিয়ে তিনি ঐ সময়ে (১৯৪১) ঐ পত্রিকায় বিজ্ঞানবিষয়ক ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁর এই প্রয়াসে সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র। অবশ্য তাঁর এই প্রয়াস স্থায়ী হয় নি।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রীতির আরও একটি সুন্দর বিবরণের অংশবিশেষ তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। এটি লিখেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

জার্মান ভাষায় তাঁর দখলের পরিচয় আগেই পেয়েছিলুম। ফরাসী ভাষায় দখলের পরিচয় আরো কয়েকবার পেলুম। একদিন দেখি মিশলে রচিত মূল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়ছেন। বললেন, ইংরেজী তর্জমা পড়ে আশ মেটেনি। বহু চেষ্টায় মূল সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তাই তন্ময় হয়ে অধ্যয়ন করছেন। ফরাসী বিপ্লব আমার নিজের প্রিয় বিষয়। অথচ আমি তার জন্যে আয়াস স্বীকার করিনি। আলোচনাও করলেন কৌতূহলীর মতো। সেরকম কৌতূহল যদি ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখতুম।...

এর পরে একদিন লক্ষ্য করি তিনি ফরাসীদের আরো পুরোনো ইতিহাসে মগ্ন। বললেন, ফরাসী বিপ্লবকে বুঝতে হলে আরো কয়েক শতক পেছিয়ে যেতে হয়। তাই তিনি পড়ছেন ষোড়শ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত।...অন্য একদিন দেখি সংস্কৃত বই পড়ায় নিবিষ্ট। ভাসের "চারুদত্ত"। সবটা মনে নেই। যতদূর বুঝলাম পরবর্তী নাট্যকারের "মৃচ্ছকটিক" এরই উপর ভিত্তি করে রচিত। কোনটা আগে কোনটা পরে তার প্রমাণ একই শব্দের বিবর্তন। এর থেকে এলো শব্দতত্ত্ব। সংস্কৃত খুব ভালো জানা ছিল তাঁর। আমার তেমন নয়। অবাক হয়ে শুনলুম। আরেকদিন দেখি পিসেল প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণের মুল জার্মান গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ তাঁর হাতে। মূলও তিনি

পড়েছেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি যেন কত জানি! এরপরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মশারি খাটিয়ে শুয়েছেন। ভাবলুম অসুখ বিসুখ করেছে। তা নয়। মশার জ্বালায় মশারির আশ্রয় নিয়েছেন। সেই অবস্থায় পড়া হচ্ছে আফ্‌গানিস্থানে সদ্য আবিষ্কৃত অশোকের আরামাইক লিপিতে উৎকীর্ণ অনুশাসন, আমার কাছে নতুন।...বিদ্যা—তা যে কোনো বিভাগেরই হোক—সত্যেন্দ্রনাথের নিঃশ্বাস বায়ু। জ্ঞানকে তিনি বিভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ রাখবেন না। তিনি বিজ্ঞানী বলে সেই একটি কক্ষে আবদ্ধ থাকবেন না। সমস্ত জ্ঞানই অবিচ্ছিন্ন একটা প্রবাহ। যেখানে খুশি যখন খুশি অবগাহন করবেন। তৃপ্ত হবেন। তাজা থাকবেন।...

১৯৪৫। ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় এলেন সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজের খয়রা অধ্যাপক রূপে। তখন থেকেই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন তাঁর স্বপ্নের সৌধ, তাঁর মহৎ কীর্তি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে তুলবার জন্য। তখন থেকেই তিনি এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সুমহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন এবং তাঁর কয়েকজন উৎসাহী সহকর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করার পর পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হয়।

১৯৪৮। ২১ ফেব্রুয়ারি।

পরিষদের প্রথম অধিবেশন হলো। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। সেদিন এর উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।'

সার্কুলার রোডে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উল্টোদিকে ফেডারেশন হলের একতলায় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস দীর্ঘকাল ছিল। এর

গোড়া থেকেই কয়েকজন উৎসাহী কর্মীকে পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর পরিচিত সকলকেই বলতেন, এবার কাজে লেগে যাও। কিছুকাল পর প্রকাশিত হলো পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে এই পত্রিকায় বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরিষদের জন্য একটা নিজস্ব বাড়ি দরকার— এই চিন্তা তাঁর সর্বক্ষণ ছিল। তারপর তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গোয়াবাগানে তাঁর বাড়ির কাছে একখণ্ড জমিতে যেদিন পরিষদ ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়, সেদিন এই বিজ্ঞান-সাধকের যে কী আনন্দ হয়েছিল তা বলবার নয়।

১৯৬৪। ১ জানুয়ারি।

বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

তিনি সত্তরের কোঠায় পদার্পণ করলেন। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী নিবেদন করলো তাঁকে তাদের প্রাণের অর্ঘ্য। তাঁর সত্তরতম জন্ম-তিথি পালন করবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস দেখা গেল সর্বস্তরের বাঙালীর মধ্যে—এই উৎসব শুধু বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানীর জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো মহাজাতি সদনে। শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ-বিমণ্ডিত ঋষিকল্প এই বিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে দলে দলে এসেছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রগোষ্ঠী, সতীর্থ ও বন্ধুগণ। এসেছিল সাধারণ মানুষও যাঁদের কাছে সত্যেন বোস একটি কিম্বদন্তীর মূর্তি হয়ে উঠেছিলেন। এই সেই বিজ্ঞানী যাঁর নাম মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের উত্তরসাধক এই মানুষটিকে সেদিন শুধু যে ভারতের রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তা নয়, বিদেশ থেকেও একাধিক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও রয়্যাল সোসাইটি প্রমুখ বিদেশী সংস্থাও অভিনন্দিত

করেছিলেন তাঁকে। সেদিন তাঁকে যে অভিনন্দন পত্রটি প্রদান করা হয়েছিল সেটির কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম—

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

সপ্ততিতম জন্মদিনে—

আচার্যদেব,

সুদীর্ঘকাল পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ গবেষণায় সাফল্য লাভ করে জগতের বিজ্ঞান সাধনাকে তুমি বিশেষভাবে সম্পদশালী করেছ। যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় আজ ভারত বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত তুমি তাঁদেরই অন্যতম। বিজ্ঞানভারতীর অতিথিশালায় তোমারই হস্তের প্রদীপ অনির্বাণ শিখায় আজ প্রদীপ্ত। আমরা তোমার স্বদেশবাসী, ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ আমাদের গৌরবের অবধি নেই।

... ...

হে বিশ্ববরেণ্য,

বাংলার সুযোগ্য সন্তান তুমি। কিন্তু তোমার যশ শুধুমাত্র বাংলা বা ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে আজ পরিব্যাপ্ত। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চায় তুমি উদ্বুদ্ধ করেছ দেশবাসীকে। বিদ্যার আরাধনায় তুমি উৎসর্গ করেছ তোমার সমগ্র সত্তাকে। সে পূজার শুভ্র জ্যোতি দিক্-দিগন্তরে বিচ্ছুরিত। শিশুসুলভ সারল্য আর মধুময় হাসির সঙ্গে কঠোর সত্যনিষ্ঠা তোমার মানবতাকে মহিমান্বিত করেছে। তোমার গভীর মানবপ্রীতি ও চরিত্রমাধুর্যে সকলেই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তুমি আমাদের হয়েও সকলের, ভারতের হয়েও বিশ্বের। তোমার কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করি। তুমি আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার গুণমুগ্ধ দেশবাসী।

মহাজাতি সদনে সেদিনকার সেই স্মরণীয় উৎসব-সভায় সুসজ্জিত মঞ্চের ওপর থেকে এই অভিনন্দনের উত্তরে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে বললেন—'স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

একটি দায়িত্ব এসেছে। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিতের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের সকলের কাছে পৌঁছে যায়।' তখন তাঁর এই কথাগুলি উপস্থিত সকলেরই হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল—উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সেবায়।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের আর একটি দিক আছে। সেটি হলো তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যসেবা। যাকে বলে বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক, তিনি ছিলেন ঠিক তাই। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে প্রবল অনুরাগ জন্মায় আর সেই অনুরাগ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমানভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর শেষ জন্মদিনেও তিনি আমাদের ফরাসী গল্পের একটি অনুবাদ উপহার দিয়ে গেছেন। দেশী ও বিদেশী সাহিত্য তিনি যত্নের সঙ্গেই পাঠ করেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিনি একজন সত্যিকার সমঝদার পাঠক ছিলেন। তাঁর বৈঠকখানায় শনিবারের বৈঠকে যত বিষয়ের আলোচনা হতো সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সাহিত্য। বিশেষভাবে তিনি ছিলেন কাব্য ও সাহিত্যরসিক আর সংগীতপ্রিয়। তিনি একজন দক্ষ এস্রাজ বাজিয়ে ছিলেন এবং আজীবন বাজিয়ে গেছেন। যদিও তিনি একান্তভাবে রবীন্দ্রভাবের ভাবুক ছিলেন, এবং যদিও বাংলা সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ, কিন্তু তাঁর আগ্রহ ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী সাহিত্য পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। সবুজপত্র, বিচিত্রা ও পরিচয় প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের আজীবনের সাহিত্যপ্রীতির পুরস্কারস্বরূপ ১৯৫৮ সালে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জব্বলপুর অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ মূল সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ঐ অধিবেশনে তাঁর ভাষণটি সেই সময়কার বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

নির্ণয়ে খুবই চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাগর্ভ ছিল। সকলেই জানেন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কত সম্মেলনই যে তাঁর উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে তা বোধ করি গুণে শেষ করা যায় না। মোট কথা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীত—এই চার মুখেই কথা বলতেন সত্যেন বোস। গভীর চিন্তার পরিচয় থাকত সে-সব কথার মধ্যে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে 'পরিচয়' সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্নদাশংকর রায় যথাক্রমে তাঁদের 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ ও 'জাপানে' ভ্রমণগ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। জব্বলপুরে বলেছিলেন—'সাহিত্যকে শুধু কল্পলোকের মনগড়া কাহিনী বিবৃত করলে চলবে না, এই মাটির পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও সাহিত্যিকদের বলতে হবে এবং তা ব্যক্ত করতে হবে সহজ সরল অন্তরস্পর্শী ভাষায়।'

এইবার মানুষ সত্যেন বোসের কথা।

নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে সব মহান দিকের পরিচয় অনেকে পেয়েছেন তাতে সকলেই মুগ্ধ অভিভূত হয়েছেন। বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আমাদের মনকে যতখানি টেনেছেন, অনেকের মতে, তার চেয়েও বোধ হয় বেশি টেনেছেন মানুষ হিসাবে। তবু মানুষ হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথকে কতটুকু জানতে পেরেছি আমরা? দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ-মমতা, উদারতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণের আধার ছিলেন এই মানুষটি।

'সত্যেন বোস'—এই নামটি উচ্চারণ করলে আজ আমাদের মানসপটে এমন একটি মধুর সুন্দর প্রকৃতির মানুষের মূর্তি ভেসে ওঠে যা এ যুগে বিরল বললেই হয়। মাথায় একরাশ শুভ্রকেশ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, আত্মবিশ্বাসে উদ্ভাসিত মুখ—এক কথায় এক বিদগ্ধ বাঙালী মনীষীর ছবি। পোশাকে-পরিচ্ছদে, আচারে-ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় ইংরেজীয়ানার ধার দিয়েও তিনি ঘেঁযতেন না। মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী। তাঁর আপাদমস্তক নির্ভেজাল

বাঙালীয়ানায় বিভূষিত ছিল, অথচ তাঁর মধ্যে কখনো দেখা যায় নি জাতিগত বা দেশগত সংকীর্ণতা। বহুগুণের সমাবেশে গঠিত ছিল তাঁর চরিত্র। কিন্তু সে চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি—নৈতিক দৃঢ়তা, আর স্বাধীনচিত্ততা।

তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে প্রখ্যাত কবি, গায়ক ও সাধক দিলীপ কুমার রায় একজন। তিনি লিখেছেন—'সত্যেনের সৌম্যমুখে কি একটা মায়া মাখানো থাকত—দেখলে ভোলা যায় না। মানুষকে সে কাছে টানত যেমন সহজে চুম্বক টানে আলপিনকে। ···তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে আমি মাধুর্যের স্বাদ পেয়ে এসেছি দিনের পর দিন। সত্যেন বলতো, ভালবাসো ভালবাসাও। এই আশ্চর্য ভালবাসার ক্ষমতাই আমি মনে করি তার ব্যক্তিরূপের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার মতো বন্ধুবৎসল মানুষ আমি কমই দেখেছি।'

তরুণ বয়সে তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন কিছু করতে হবে, যাতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি হয়, জগৎসভায় ভারত বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। নিজের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অবদান দিয়ে তিনি মাতৃভূমিকে বিশ্বসভায় গৌরবোজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাইলেন বিজ্ঞানকে ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে পরিচয় করাতে হবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে। এই জন্যই তো তিনি বার বার মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার কথা বলতেন।

তাঁর এক ছাত্রী—ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়—মানুষ সত্যেন্দ্র-নাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—'বিজ্ঞান কলেজে থাকাকালীন বহু ঝড়ের সম্মুখীন আমি হয়েছি। কিন্তু অধ্যাপক বসু সকল সময়েই তাঁর পক্ষপুটে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে আগস্ট মাসে আমি পিতৃহীনা হলাম, আর তার ঠিক চার মাস পরে আমার স্বামী চিরদিনের জন্য বিদায়

নিলেন। এই মর্মান্তিক দুঃখের দিনে তিনি পিতার স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি তাঁর অপার পিতৃস্নেহে আমায় মানসিক শান্তি দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে প্রগাঢ় স্নেহ পেয়েছি। আমার স্বামীও সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন নি। তাঁর সঙ্গে সকলের এক অদ্ভুত আত্মিক যোগ ছিল। তাই সকলকে তিনি আপন করে নিতে পারতেন। তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পুত্র-কন্যার মতো ভালবাসতেন।'

কবি বিষ্ণু দে সত্যেন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন—

... ...

কৌতূহল অন্তহীন, দুর্গম শূন্যের তত্ত্বে
তথা নিরপেক্ষ দৈনন্দিনে
জিজ্ঞাসা প্রখর সদা জ্ঞানে জ্ঞানে।
জানি না এ অতিমস্তিষ্কের জটিলতা
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা, বেহিসাবী,
নির্বিকার, সাত্ত্বিক প্রসাদ।
অথচ হৃদয়বত্তা এখানে দুর্লভ কি নির্বোধ কিবা মূর্খে,
এখানে যে দিন যায় সত্তা বেচে কিনে সফলে বিফলে,
প্রতিদিন একই রসাতলে,
তাই আমাদের আজন্ম উদ্‌ভ্রান্ত অবসাদ, কূটঘৃণা, লুব্ধ দুঃশীলতা,
আমাদেরই কলকাতায় এ জাতক আশৈশব প্রতিভায় অগ্নিময়,
সত্তরের জন্মদিনে তাই জরা শুধু কেশাগ্রেই ক্ষান্ত।
অমর্ত্য শিশুর শতায়ুই খুব স্বাভাবিক।

পরের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে খুব কম লোকেই পারে। বিদ্যাসাগর, প্রফুল্লচন্দ্র ও বিবেকানন্দের পর আমরা সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে এই ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হই। এরই একটা কাহিনী অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর এইভাবে লিখেছেন—

'আমার সমসাময়িক বন্ধু পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন ঢাকা ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পরে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। পুণ্যেন্দ্রনাথও সত্যেন্দ্রনাথকে বড় ভাই-এর মতো শ্রদ্ধা করতেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ পুণ্যেন্দ্রনাথের মস্তিষ্কের বিকৃতি হতো। এ অবস্থায় তাঁকে সামলানো খুবই মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। কতবার দেখেছি তাঁর এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পারিবারিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে শুশ্রূষা করেছেন, নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন।'

সত্যেন্দ্রনাথের দরদী অন্তরের স্পর্শ তাঁর বন্ধুজন ও সহকর্মীরা যেমন পেয়েছেন, তেমনি বয়সে যারা ছোট তারাও তাঁর হৃদয়ভরা স্নেহে নিত্য অভিষিক্ত হতো। সকল ছাত্র-ছাত্রীরই তিনি মাস্টার মশাই হতেন। তাদের কাছে তিনি কেবল শিক্ষাদাতা আচার্য ছিলেন না, ছিলেন তাঁদের সুখদুঃখের সমব্যথী অভিভাবকের মতো। দেখেছি তিনি যেমন তাদের কাজকর্মের বা পড়াশুনার খবর নিতেন তেমনি তাদের বাড়ির খবরও নিতে ভুলতেন না। তাঁর কাছে কাজ উপলক্ষে যে কোন ছাত্র আসত, কাজের কথা হবার পর তিনি নিজে থেকেই তার বাড়ির কথা জানতে চাইতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কার্ডের দরকার হতো না—তাঁর ঘরের দরজা সকলের জন্যই খোলা থাকত।

দাতা হিসাবেও সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়বত্তার পরিচয় অনেকেই পেয়ে ধন্য হয়েছে। তাঁর হৃদয়টা ছিল বাঙালী মায়েদের মতো কোমল আর মমতা মাখানো। বিজ্ঞান কলেজে তাঁর অধীনস্থ একটি কর্মী মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে অর্থসাহায্য নিত। একবার তিনি তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন। এমন সময় সেই কর্মীটি এসে তাঁর কাছে অর্থসাহায্য চাইলো। সেদিন তাঁর মানিব্যাগে টাকা-পয়সা বিশেষ ছিল না। যা ছিল, ব্যাগটি উপুড় করে সব টেবিলের ওপর ঢেলে

কর্মীটির হাতে দিয়ে বললেন, 'ব্যাগে যা ছিল সবই তোকে দিলাম। আজ এখন যা।' অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন—"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দানের সাগর বলা হয়। আমাদের সত্যেন্দ্রনাথকেও ঐ একই আখ্যা দিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ছাত্র, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব এবং দেশের দুঃস্থ কত লোককে যে তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। নিজের কথা তো তিনি ভাবেনই না— নিকট আত্মীয়দের কথাও তিনি চিন্তা করেন কিনা সন্দেহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "খয়রা"—অধ্যাপক নিযুক্ত হ'য়ে ১৯৪৫-সনে যখন তিনি ঢাকা ছাড়েন, সেই সময়কার একটি কথা আজও আমার মনে পড়ে। পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে তাঁর ঘরে একদিন তাঁকে অনেকক্ষণের জন্য দেখা যায়নি। নিজের ঘরে যখন ফিরে এলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" তিনি তাঁর সরল হাসি হেসে বলেছিলেন—"আমার ব্যাঙ্কে গিয়েছিলুম, সব লাল আজ কালো ক'রে এলুম।" বুঝতে বাকী রইল না যে তিনি তাঁর ব্যাঙ্ক শূন্য করে কত লোককে কত উপকার করেছেন……।" এভাবে সারাজীবন নিজের কথা চিন্তা না করে, তিনি কত লোককে যে অকাতরে সাহায্য করেছেন তা গুণে শেষ করা যায় না। তাই দীর্ঘকাল ভালো উপার্জন করা সত্ত্বেও সঞ্চয়ের দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃসম্বল ছিলেন।

তাঁর স্নেহ ভালবাসা শুধুমাত্র মানুষের প্রতি বর্ষিত হতো না, জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর স্নেহ কম ছিল না। তাঁর পোষা একটি কুকুর ও দুটি বিড়াল ছিল। একটি বিড়ালের নাম ছিল কেলো। অপরটির নাম গদা। গদাকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। বিরাট চেহারা। সত্যেন্দ্রনাথ তাদের আদর করতেন, খাবারের ভাগ দিতেন। তাদের জন্য প্রতিদিন মাছের ব্যবস্থা ছিল। তারা স্বচ্ছন্দে তাঁর বিছানায় শুয়ে প্রভুর আদরের স্পর্শলাভ করে

পুলকিত চিত্তে তাদের মোটা লেজ দিয়ে তাঁর হাত ছুঁয়ে নিজেদের সান্নিধ্য জানিয়ে দিত।

সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে নিঃস্বার্থ ভালবাসার পর যে মহৎ দিকটা সকলকে আকৃষ্ট করত তা হলো তাঁর আত্মউদাসীন নিরহংকার ভাব। আজকের যুগে যাঁরা একটু খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের দেখা যায় আত্মপ্রচারে পঞ্চমুখ আর সেজন্য কিরকম আত্মশ্লাঘাই না তাঁরা বোধ করে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠিক এর উল্টো—অমন বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করেও নিজের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একেবারেই নীরব ও উদাসীন। নিজের বা নিজের কাজ সম্বন্ধে কোন কথা তিনি সচরাচর বলতেন না এবং তাঁর নাম প্রচারের কোন আয়োজন হলে তা সযত্নেই এড়িয়ে চলতেন। সাংসারিক ব্যাপারেও তিনি উদাসীন ছিলেন। জীবন থেকে দূরে ছিলেন না, তাঁর চিন্তা-ভাবনা কোনদিন জীবনবিমুখ ছিল না। তবু দেখা যেত তাঁর মধ্যে একটা নিরাসক্ত বৈরাগ্যের ভাব। এইখানেই তাঁর ঋষিত্ব।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কোন খ্যাতি বা প্রতিপত্তির পেছনে ছোটেন নি। এমন কি তাঁর কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল এম. এস-সি ডিগ্রীটুকু নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন চিরকাল। ডক্টরেট পাওয়ার জন্য কোন দিন থিসিস পেশ করেন নি বা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যও তদ্বির করেন নি। খ্যাতিই তাঁকে অন্বেষণ করেছে চিরকাল। সত্যসাধক ঋষির মতো সত্যেন্দ্রনাথ নাম বা যশের প্রতি ছিলেন চির-উদাসীন।

'আত্ম-উদাসীন' ছিলেন বলেই সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এত নিরহংকার সহজ সরল মানুষ। উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেও মানুষ হিসাবে তাঁর দ্বার সকলের কাছে ছিল সদা অবারিত। তাঁর ঘরে যে খুশি, যত খুশি লোক আসতে পারত। সমাজের উঁচুতলা থেকে নীচুতলার যে কোন লোক তাঁর ঘরে ঢুকতে পারত—সেজন্য অনুমতির দরকার হতো না। এখানে তাঁর চরিত্রের ঋষিত্ব ভাবটি দেখে সবাই মুগ্ধ

হতো। এইজন্যই লোকে বলত—সত্যেন বোস অজাতশত্রু মানুষ। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কোমল হৃদয়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বজ্র-কঠোর সত্যনিষ্ঠ। জীবনে কোনদিন কোন অবস্থায় তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। সত্যরক্ষার জন্য স্পষ্ট কথা বলতে তিনি কখনো দ্বিধা বোধ করেন নি। খুব মানী লোক বা অন্তরঙ্গ বন্ধুজন থেকে অপরিচিত সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলকেই প্রয়োজন বোধে অকপটে সত্য কথা বলতেন। এর ফলে অনেক সময় তাঁকে অনেকের কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছে, অনেককে ক্ষুণ্ণ হতে হয়েছে, হয়ত বা কোন সময় তাঁর স্বার্থহানিও হয়েছে। কিন্তু যা সত্য বলে তিনি মনে করেছেন তা থেকে কেউ কোনদিন তাঁকে টলাতে পারে নি। তাই মনে হয় তিনি সার্থকনামা পুরুষ ছিলেন। 'যা সত্য বলে মনে হয়েছে, আজীবন তাই করার চেষ্টা করেছি'—তাঁর এই একটি কথার মধ্যে আমরা সত্যনিষ্ঠ মানুষটির যেন সম্পূর্ণ মূর্তি দেখতে পাই।
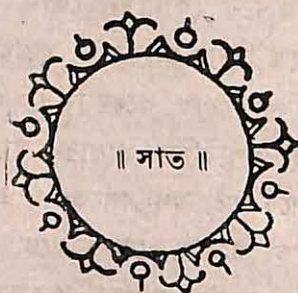
১৯৭৪।

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন। মঙ্গলবার।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ৮০তম জন্মদিন আজ। এটা যে তাঁর জীবনের শেষ জন্মদিনে পরিণত হবে, সেদিন কেউ একথা ভুলেও চিন্তা করে নি। প্রতি বছরের মতো সেদিনও—সেই ১৯৭৪ সালের পয়লা জানুয়ারি—তাঁর ঘরটি অতি পরিপাটি ভাবে সাজানো হয়েছিল। রজনীগন্ধার স্তবক, টকটকে লাল গোলাপ গুচ্ছ, ফুলের মালা আর সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়া—সবকিছু মিলিয়ে ঘরটির মধ্যে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর বসবার খাটের বাঁ দিকের দেওয়ালে বিলম্বিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি পুষ্পমাল্যে যেমন বিভূষিত ছিল, তেমনি ডানদিকের দেওয়ালে বিলম্বিত আইনস্টাইনের অপূর্ব তৈলচিত্রটিও ছিল মাল্যভূষিত। সকাল থেকেই দলে দলে আসছে তাঁর অগণিত অনুরাগী, বন্ধু ও ছাত্রছাত্রী তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। প্রতি বছরই তাঁরা এই দিনটির জন্য যেন আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন।

এবারকার জন্মদিনের সংবর্ধনার আয়োজনটা যেন অন্যান্য বছরের তুলনায় ছিল আরো বর্ণাঢ্য, আরো সমারোহপূর্ণ। কারণ তাঁর

৮০তম জন্মদিনের সঙ্গে এবার মিলেছিল তাঁরই উদ্ভাবিত বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উৎসব। যাঁরাই সেদিন সকালে সত্যেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন তাঁরাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, গৌরব-মণ্ডিত জীবনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেও এই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী বাল্যের সেই শুচিশুভ্র সারল্য, শৈশবের সেই সংশয়বিহীন জীবনবোধ এবং যৌবনের সেই উদার জীবনদৃষ্টি থেকে এতটুকু বিচ্যুত বা বিযুক্ত হন নি। তাই তো ১৯৭৪ সালের নববর্ষের প্রথম দিনে সূর্যালোকিত সেই প্রসন্ন প্রভাত পুষ্পমালা চন্দন পরিশোভিত তাঁর জন্মদিনের আসরে তাঁকে সহাস্যবদনে বসে থাকতে দেখে সকলের মনে হয়েছিল, এই অজাতশত্রু মানুষটির চেয়ে সুখী মানুষ বোধ হয় আর কেউ নেই। তাঁর জীবনবিধাতা বুঝি স্বহস্তে তাঁর প্রশস্ত ললাটে সুখের এই রাজটীকা এঁকে দিয়েছেন।

সকাল থেকেই যেন জন্মদিনের শুরু হয়ে গেছে ঈশ্বরমিল লেনে বাইশ নম্বরের সেই বাড়িটিতে যেখানে আশি বছর আগে জন্মেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সকাল থেকেই দলে দলে লোক এসে তাঁকে জানাচ্ছে বিনম্র প্রণাম ও অন্তরের শ্রদ্ধা। সকলেই আসছেন প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে—কেউ আসছেন ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে, কেউবা সন্দেশের বাক্স নিয়ে, আবার কেউবা অন্য কোন উপহার নিয়ে। ধুতি ও পাঞ্জাবীতে সজ্জিত সত্যেন্দ্রনাথ সকলকেই সহাস্যবদনে জানাচ্ছেন স্বাগত—বয়সের বিচার নেই, পদ-মর্যাদার হিসাব নেই তাঁর কাছে। সমান আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করছেন সকলের নিবেদিত প্রীতির ডালি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। সকলের স্নেহ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তিনি গ্রহণ করছেন সহাস্য মুখে আর ঘন ঘন হাঁক দিচ্ছেন, ওরে, ওদের সবাইকে মিষ্টি এনে দে। সে-দৃশ্য ভুলবার নয়।

সেই এক শুচিশুভ্র প্রাণোচ্ছল দৃশ্য।

সেই এক সর্বজনীন আনন্দময় পরিবেশ।

কারো জন্মদিনের উৎসবে এমন প্রীতি ও শ্রদ্ধামণ্ডিত রূপ খুব কমই দেখা যায়।

১৯৭৪, ৪ ফেব্রুয়ারি। সোমবার।

ঈশ্বরমিল লেনে সেই লাল রঙের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে অন্য একটি বিষাদমলিন দৃশ্য দেখা গেল। একমাসের ব্যবধানেই সেই বাড়িতে নেমে এলো মৃত্যুর করাল ছায়া। সেদিনও সকাল থেকে অগণিত জনস্রোত ঐদিকে চলেছে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তাদের আপনজনকে শেষ বারের মতো দেখতে। সেই বাড়ি আজ বিষাদে আচ্ছন্ন—সেখানে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। বৈঠকখানা ঘরের সেই পালঙ্কের ওপর শায়িত বিজ্ঞানসাধকের বিগতপ্রাণ দেহ। আজো সবাই এসেছে শেষ প্রণাম নিবেদন করতে সেই মানুষটিকে যিনি ছিলেন সকলের প্রিয়—যিনি ছিলেন মানবদরদী। তারে ও বেতারে বিঘোষিত হলো মর্মান্তিক সংবাদ—সত্যেন বোস নেই, নেই সেই বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানী যাঁর খ্যাতি য়ুরোপের বিজ্ঞানজগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন সারা দেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে চলেছে বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উৎসব; তখনো শুভ্রকেশ সহাস্যবদন এই বিজ্ঞানীকে কেন্দ্র করে একাধিক স্থানে চলেছে জ্ঞানী-গুণীদের আলোচনা-চক্র। সেইসব আলোচনা সভায় তাঁকে উপস্থিত থাকতেও হয়েছে। নববর্ষের প্রথম দিনটি থেকে তাঁর যেন বিশ্রামের অবসর ছিল না। এমন সময়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো সবাই সংবাদ পেলো—সত্যেন বোস নেই।

বাঙালী প্রত্যক্ষ করলো একটি মহৎজীবনের মহৎ পরিণতি।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালেই দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে সার্বজনীন হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই মানুষেরই বন্দনা রচনা করেছেন যাঁরা একাধারে অনন্যসাধারণ অথচ সার্বজনীন। এমন মানুষ পৃথিবীতে সব সময়ে জন্মগ্রহণ করেন না। বাঙালীর সৌভাগ্য, ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে বিগত শতাব্দীর অন্তিম

লগ্নে এমনি একজন মানুষ এই মহানগরীতে এক অতি সাধারণ মধ্য-
বিত্তের সংসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর একটি শতাব্দীর অন্তিম
প্রহরের কাছাকাছি এসে তিনি আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে চিরদিনের
মতো সরে গেলেন—পিছনে রেখে গেলেন একটি নিষ্কলঙ্ক ও মহিমান্বিত
জীবনের আদর্শ।

বিজ্ঞানজগতে অনন্যসাধারণ আবেদনের দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ যেমন
নব দিগন্ত উন্মোচন করে গিয়েছেন, তেমনি তাঁর স্বদেশবাসীর সামনে
তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন একটি মহৎ ও সার্বজনীন চরিত্রের অম্লান
আদর্শ। যে প্রতিভা একদিন তরুণ বয়সে বিশ্বরহস্যের মর্মকথা
উদঘাটন করে বিজ্ঞানজগতে অসাধ্যসাধন করেছিল, আমরা দেখলাম,
পরিণত বয়সে সেই প্রতিভাই আত্মসমাহিত জ্ঞান-তপস্বীর পরম
উদারতায় ছোট-বড়ো নির্বিশেষে তাঁর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে
টেনে নিয়ে গুরু-শিষ্য মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করল। আবার অন্য-
দিকে সেই প্রতিভাই স্বজাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছে।
যাঁরা তাঁর জীবনেতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করবেন তাঁরা দেখতে
পাবেন সত্যেন্দ্রনাথের সকল সাধনার পিছনে ছিল স্বদেশের গৌরব
বর্ধন করবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা
সর্বদা বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত।

জাতীয় মহত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন।

সেই মহত্বের সাধনাতেই সার্থক সত্যেন্দ্রনাথের জীবন।

নব ভারতের সর্বসাধনার মধ্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

এই বিজ্ঞান সাধকের জীবন তাঁর কীর্তির চেয়ে মহত্তর। আগেও
বলেছি আবার বলছি, তাঁর সকল সাধনার পিছনে ছিল জন্মভূমির
গৌরব বর্ধন করা। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র সবাই এই আদর্শ রেখে
গেছেন। তাঁদের উত্তরসাধক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথও সেই আদর্শকে
সামনে রেখেই চলেছিলেন আজীবন। তাইতো আমরা দেখতে

পাই কী দেশে, কী বিদেশে, কী কর্মে, কী চিন্তায় তিনি এই আদর্শের একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন।

ভবিষ্যতের বাঙালী সন্তান যখন এই বিজ্ঞানীর জীবন নিয়ে আলোচনা করবে তখন তারা কি দেখতে পাবে তাঁর জীবনের মধ্যে ? দেখতে পাবে—মানুষটি সর্বাংশে, রুচিতে ও মেজাজে এবং আহার-পরিচ্ছদে—বাঙালী ছিলেন, অথচ মনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিশ্বমানবিক। একদিকে তিনি যেমন স্বদেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জাগাবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন, অন্যদিকে ধর্মসম্প্রদায় ও জাতীয়তার ওপরে ছিল তাঁর মনের প্রসার। তাই যেখানেই তিনি মানুষের কথা বলেছেন সেখানে তাঁর ভাষণের মধ্যে অনুরণিত হতো বিশ্বজনীন সুর—কোন একটি বিশেষ দেশ বা জাতির মর্মধ্বনি নয়।

সেবার (১৯৬২) যখন জাপানে গিয়েছিলেন তখন সেই দেশে 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে বেজে উঠেছিল এই বিশ্বজনীন সুর—'বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সকল জাতিকে এক নবযুগের সন্ধান দিতে পারেন।—সে যুগে বিভিন্ন জাতি বৈষয়িক প্রগতির তারতম্য সত্ত্বেও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।···বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদি ভাই-ভাই ইচ্ছাটা জেগে ওঠে, তাহলে আমরা সুফলের আশা করতে পারি আর তখনই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন শুধুমাত্র মাতৃভূমির কল্যাণে নয় সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হবে।'

সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ছিলেন—বিজ্ঞানই ছিল তাঁর স্বধর্ম, অন্য ধর্ম তিনি কতটুকু মানতেন, বা আদৌ মানতেন কি না সে আলোচনা নিষ্ফল। সকলের আগে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানসাধক ; তাঁর জীবন-দর্শন তাই ধর্ম-ঘেঁষা ছিল না। প্রচলিত ধর্মের প্রতি বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ তিনি কোনদিনই পোষণ করতেন না, এবং এই কারণে

তাঁর বন্ধুমহলে তাঁর সম্পর্কে এই অপবাদ প্রচলিত ছিল যে, সত্যেন বোস নাস্তিক। কিন্তু তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায় ধর্ম সম্পর্কে এই বিজ্ঞানীর মনোভাব বিশ্লেষণ করে বলেছেন 'সত্যেন স্বভাবে ঠিক বিশ্বাসী না হলেও দুরন্ত সংশয়ীও নয়।' এরই আভাস আছে বন্ধুকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে—'সৃষ্টির রহস্য আমরা কেউই ভেদ করতে পারিনি ভাই।...সারাজীবন তুমি যে পথে যে সত্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছ, আমার কাছে তা অজানা হলেও তোমার সত্যসন্ধিৎসু মনকে তো আমি অবজ্ঞা করতে পারি না। মানুষের মনের সব দরজার খবর কি সকলে পায়?'

এই মনোভাব কি নাস্তিকের? যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীর এই কথা। তিনি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে চিরকাল সাধারণত নীরব ও সংযতবাক্ ছিলেন বলেই সাধারণের কাছে তিনি একজন নাস্তিক ও অবিশ্বাসী মানুষ বলে প্রতিভাত হতেন—যেমন হতেন বিদ্যাসাগর।' তাঁর বিজ্ঞানী-মন তথাকথিত ধর্মাচরণের ঘোরতর বিরোধী ছিল। তাই তো দেখেছি এদেশে কথায় কথায় ধর্মের ধুয়া তুলে যারা পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন তাদের সত্যেন্দ্রনাথ কখনো সমর্থন করতে পারতেন না। তিনি মনে করতেন পারলৌকিক পরমার্থ লাভের চেষ্টায় ঐহিক জীবনের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে ভারতবাসীর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতো এই বিজ্ঞানসাধকও বলতেন—'আত্মমুক্তির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে জীবনকে মানবোচিত দৃষ্টিতে দেখতে হবে।'

এই বিজ্ঞানসাধককে প্রণাম॥

পরিশিষ্ট

বিজ্ঞানীর জীবনদর্শন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আমার জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। মানুষই চরম ও পরম সত্য যা আমাদের প্রত্যেকের উপলব্ধি করা উচিত। আমাদের দেশের এক প্রাচীন কবির এই বাস্তব জীবনবোধকে একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ আমি এই আদর্শের মধ্যে দেখতে পাই। যে সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে, যা কিছু মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী তা আমি কোনদিন সমর্থন করি নি।

আমি যে আমার নিজের দেশকে ভালবাসি না তা নয়। তবে আমি এই বলি যে, ভালবাসা যদি এমন রূপ নেয় যাতে পদে পদে সত্যের অপলাপ করতে হয়, তাহলে সে ভালবাসার কোন দাম নেই। যাকে গ্রহণ করতে হবে, যার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার যদি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি গুণ বলে বর্ণনা করি তাহলে সে কাব্যের জগতেই চলে। মানুষের মধ্যে সেই মনোভাব আনা খুব কঠিন।

অনেককে বলতে শুনেছি যে, আজকাল এদেশে ও অন্যত্র বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার ফল হয়তো শেষ অবধি মানবসমাজের পক্ষে 'মঙ্গলময় হবে না'। দুঃখের কথা এই যে, যাঁরা দেশে দেশে রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন, তাঁরা বিজ্ঞানী নন। অনেক সময় তাঁরা ধার্মিক, অনেক সময় তাঁরা জাতীয়তাবাদী।...বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের মধ্যে হিংসাদ্বেষ

হানাহানি বেড়ে গেছে—এই অনুযোগও অনেকে করে থাকেন এবং তাঁরা সেই সঙ্গে এ-কথাও বলেন যে, ধর্মের পথে মানুষ চালিত হলে এসব দূর হবে। ইতিহাস কিন্তু এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব যে পৃথিবীতে যেসব দেশে ধর্মভাব প্রবল ছিল, দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রবল ছিল সে-সব দেশেও কোনকালে হিংসাদ্বেষ সংঘাতের বিরাম হয় নি। পৃথিবীটা যদি শুধু ধার্মিক লোক দিয়ে ভরে থাকত তাহলেও বোধ করি পৃথিবী থেকে হিংসাদ্বেষ লোপ পেত না।

আজকের দিনে মানুষ যে হিংসাদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে ঐক্যের পথে ভ্রাতৃত্বের পথে এগোতে শুরু করেছে, সেটা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানচর্চার ফলেই। কেননা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ সমাজ এক—একথা কেবল বিজ্ঞানীরাই বলেছেন। আজকের দিনে মানুষ যে সারা মানুষের জন্য ভাবতে শিখেছে, বহু দেশবাসী যে একত্র হয়ে আজ ভাবতে চাচ্ছে—বিজ্ঞান না থাকলে এটা সম্ভব হতো না। মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে। সে যদি দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব অনুসরণ করে, তাহলে যে সংঘাত ও দ্বেষের প্রকোপ আজ দেখা যাচ্ছে, তার নিরসন হবে। তাহলেই সার্বজনীন বিশ্বমানবের আবির্ভাব হবে। ভবিষ্যতের সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, তার মধ্যে থাকবে সব মানুষের স্থান। বিজ্ঞানের পথেই মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতি।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমি তাই মনে করি জীবন-দেবতার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তার চর্চা ও অনুশীলন নিভৃতে দরকার। তার ভেতর থেকেই মানুষ হয়ত পাবে তার প্রতিদিন কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা। বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশঃ ওপরের দিকে চলেছে, তার সভ্যতা ঊর্ধ্ব পথে চলেছে—এটা বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি নিছক কল্পনার ওপর নির্ভর করলে মানুষের জয়রথ এগোবে না।

বিজ্ঞানের সঙ্কট

(নির্বাচিত অংশবিশেষ)

—সত্যেন্দ্রনাথ বসু

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিষ খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্প বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদের জন্য কার্যকরী হতে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকরা জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়মকানুন যে জড়পদার্থের গতিবিধিতে লাগান যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে, ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কিনা, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তার পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের তারকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট বড় সব

জিনিষ সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের কোন্‌খানে ছ' বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে, শত্রুব্যূহের মধ্যে কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা জড় পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এসব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড় পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানব মন ব্যগ্র ছিল। বহু দিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণীদেহের উপাদানসমূহ সবই ঐ আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণস্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সব জিনিষ জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে সমস্ত জিনিষ তৈরী করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃসংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এটি যে, দৃশ্যতঃ কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ুস্বভাব মূলতঃ পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলেছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কিনা। ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে, টমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ বিরানব্বইটি আদি বস্তুও আবার দুটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেকট্রন। প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূলে উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকমের জড় পদার্থের মূলে বিরানব্বইটি আদ্য ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে, আদি বস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুইটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বিদ্যুৎ-কণার পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই যোজন মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌর জগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাজির সমাবেশ গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতিও তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভীতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশী। এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন

কক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন বিরাজমান। রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন এবং এই গঠনপ্রণালীর ফলে যে আদি বস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।...

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের
দুখানি অপ্রকাশিত পত্র

Prof. S. N. Bose
NATIONAL PROFESSOR

Office: 92, UPPER CIRCULAR ROAD
CALCUTTA-9
Residence: 22, ISWAR MILL LANE
CALCUTTA-6

[illegible]

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পত্রের পাণ্ডুলিপি।

Prof. S. N. Bose, F. R S.
National Professor

Office : 92, Acharya Prafulla Ch.
Road, Calcutta-9
Res : 22 Iswar Mill Lane
Calcutta 6

22 জুলাই 1970

মা অসীমা,

শুষনি[1] শাকের নির্যাস থেকে যে ভেষজ বের হয়েছিল, তা নিয়ে তোমার গবেষণার কথা মনে হচ্ছে। সেটি নিয়ে ডাক্তাররা ব্যবহার করেছিলেন Epilepsy-তে, ফল ভালই হয়েছিল বলে তখন শুনেছিলাম।

এখন সবিশেষ জানবার জন্য এই চিঠি। গিরিজার[2] নাতি বয়স অল্প, এদিকে বেশ উজ্জ্বল মেধা, স্কুল পরীক্ষায় ভাল ফল দেখায়, হঠাৎ 2/3 বার মৃগীর মত ফিট হয়েছে 5/6 মাসের মধ্যে।

খুব মন খারাপ বাড়ি শুদ্ধ সকলের। আমায় জিজ্ঞাসা করছিলেন —তোমার নিষ্কাশিত শুষনি শাক থেকে সার বস্তু নিয়ে বর্তমানে গবেষণার ফল কি দাঁড়িয়েছে ও Epilepsy-র উপর কেমন সুফল পাওয়া গেছে ইত্যাদি।

কলেজের P. BX. নষ্ট হয়ে গেছে বলে Tel-এ সব কথা বলা গেল না। তাই চিঠিতে লিখছি।

তোমার বাসায় Tel আছে কিনা জানি না। হয়তো তোমার সুবিধা হবে কোথা থেকে Tel করার—শনিবারের আগে যদি তোমার কাছ থেকে কিছু খবর পাই তো গিরিজাকে জানিয়ে দেব এই হপ্তার শেষে।

---

1. অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় শুষনি শাক থেকে 'মার্সেলীন' নামে মৃগী রোগ নিরাময়ের একটি ভেষজ উদ্ভাবন করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় তাতে সুফল পাওয়া যায়।

2. বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার।

রুশ যাত্রায় বেশ বিপদে পড়েছিলে শুনেছি। কৌতূহল রইলো সব শোনবার। দেখা হলে শুনব।

জুলি কেমন আছে?

ইতি
আশীর্বাদক
সত্যেন বোস

পত্র—দুই

Prof. S. N. Bose, F. R. S.
National Professor

Office : 92, Acharya Prafulla Ch. Road, Calcutta 9
Res : 22 Iswar Mill Lane
Calcutta-6
8 আগস্ট 1970

মা অসীমা,

মধ্যে শুনেছিলাম তুমি আবার কলকাতার বাইরে গেছ। সেদিন আমাদের বাড়িতে দেখেছিলাম বেশ ক্লান্ত তোমাকে। আশা করি, এত ঘোরাঘুরি করেও ভাল আছে শরীর।

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য[3] বলে কে একটি ছেলে অস্থায়ী ভাবে Micro-technique শিখছে Chemistry Dept-এ। মাস তিনেক নাকি কাজ করছে। তার বাবা এসেছিলেন। বলছেন, ছেলেটির যদি একটা স্থায়ী কিছু চাকরী মেলে তো সংসার অনেকটা নির্ভাবনায় চলবে। অবশ্য রামনারায়ণ যদি কাজ শিখে থাকে তো বোধ হয় টিঁকে যাবে। একটু খোঁজ নিও। ভাল খবর পেলে তার বাবা আশ্বস্ত হবেন।

স্বাঃ সত্যেন বোস

3. আচার্য বসুর বন্ধুপুত্রের এই ছেলেটি অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে পরে স্থায়ী চাকরি পান।

পত্র দুখানি রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার